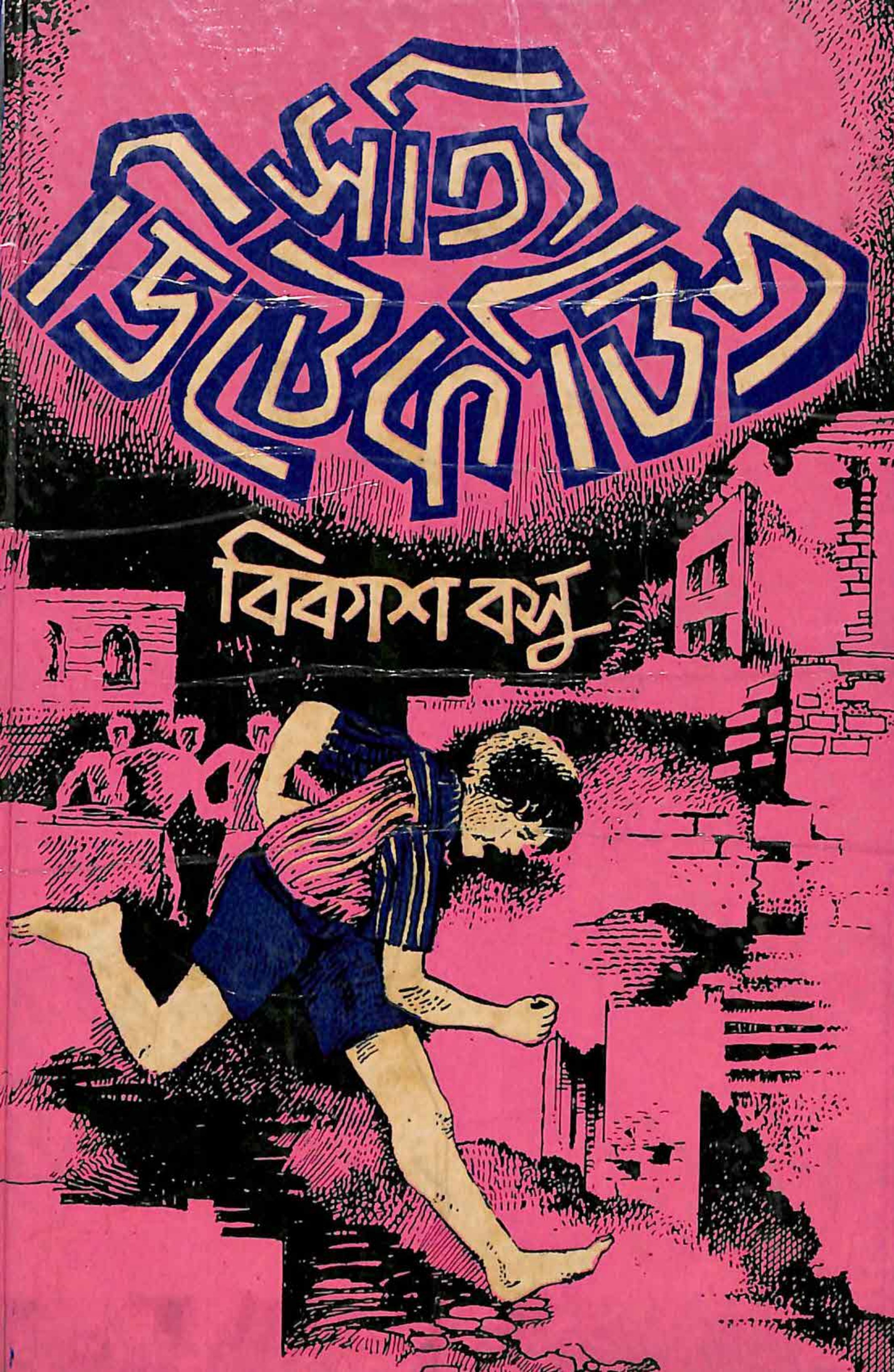

সত্যি ডিটেকটিভ
বিকাশ বসু

সত্যি ডিটেকটিভ

বিকাশ বসু



ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
[স্থাপিত : ১৯৪০]
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড : : কলিকাতা-৭০০০০৭

25. 1. 2011
14479

প্রথম
সংস্করণ :
৭ই পৌষ
১৩৯০
টা. ৬.০০
প্রচ্ছদ
ও
অলংকরণ
সুবোধ দাশগুপ্ত
প্রকাশন : কনকপ্রভা বসু
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭
মুদ্রণ : শ্রীশঙ্কর নারায়ণ হাজরা, মিতালী প্রিন্টার্স,
৩৫, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট কলিকাতা-৫



উৎসর্গ

সন্দীপকে



সত্যি ডিটেকটিভ

পরিতোষদের ঘরে পা দিতেই গুল্লুস বলে উঠল, আপনি নিশ্চয়ই ট্যাক্সিতে এলেন।

আমি সবিস্ময়ে বললুম, কী করে ধরলে?

গুল্লুস বলল, এতো খুব সোজা। বাসে যা ভিড়; মিনি বাসে এলেও আপনার জামা-কাপড়ের হাল হত অন্য রকম। কড়া ইস্তিরি লেপটে ন্যাতা হয়ে যেত।

আমি একবার আমার পাঞ্জাবী-পাজামার ইস্তিরিটা চট্ করে দেখে নিলুম, তারপর গুল্লুসের পিঠ থাবড়ে আদর করে বললুম, রাইট। ভেরি রাইট।

স্কুলে ছুটির ঘণ্টা পড়ার বেশ কিছু আগেই গুল্লুস সহপাঠীদের বলে দেয়, এবার সবাই বাড়ি যাবার জন্যে রেডি হও, ছুটির ঘণ্টা পড়বে। দু-এক মিনিট এদিক-ওদিক অবশ্য হয় কিন্তু প্রায়ই মিলে যায় তার ভবিষ্যদ্‌বাণী। ক্লাসের বন্ধুরা অবাক হয়। ক্লাসঘরে ঘড়ি নেই, ঘড়ি সেই

মাঝের ঘরে। গুল্লুসের হাতেও ঘড়ি নেই। সে কি তাহলে ম্যাজিক জানে?

ব্যাপারটা প্রায় ম্যাজিকের মতই। সে ক্লাসঘরের একটি জানলার ধারে বসে। সেটা পশ্চিমের জানলা। প্রত্যেক দিন বিকেলের বাঁকা রোদ এসে পড়ে সেই জানলায়। রোদ ও ছায়ার সীমারেখা বরাবর হাল্কা পেন্সিলে সে দাগ দিয়ে রেখেছে ছুটি হবার সময়। এ যেন তার নিজস্ব সূর্য-ঘড়ি, যার খবর একমাত্র সেই জানে। রোদ ও ছায়ার সীমা-রেখা সরতে সরতে তার আঁকা দাগের কাছাকাছি হলেই সে ঘোষণা করে দেয়—এবার ঘণ্টা পড়বে। এক একদিন কাঁটায় কাঁটায় মিলে যায় তার ভবিষ্যদ্বাণী। একে কি ম্যাজিক বলব, না কি গুল্লুসীয় বুদ্ধি বলব।

ব্যাপারটা গুল্লুসীয় তা বোধ হয় বলা যায়। অনেক কিছু ওর চোখে পড়ে যায় যা সকলের পড়ে না।

ছোটকাকার সঙ্গে ও গিয়েছিল সিনেমায়, ছটার শোয়ে Jungle Book দেখতে। ফিরে এসে বাইরের ঘরে পা দিয়েই বলল, এখানে নিশ্চয়ই লোডশেডিং সেই সন্ধ্যে থেকেই।

তখন ঘরে আলো জ্বলছে, পাখা চলছে। সবাই অবাক। সবচেয়ে বেশি অবাক আমি, বাইরের লোক, গুল্লুসের কাণ্ডকারখানা তখনো সবিশেষ জানি না। পরিতোষ বললে, কী করে বললি? নিশ্চয়ই আন্দাজে?

গুল্লুস বলল, মোটেই আন্দাজে নয়। টেবিলের ওপর তাকিয়ে দেখো। সে টেবিলে রাখা মোমবাতিটা দেখিয়ে দিল। মোমবাতিটা তো নেভানো। তাহলে?

তাহলে আবার কি? যাবার সময় দেখে গেছি প্রায় আস্ত, এই ছয় ইঞ্চি সাইজের, ফিরে এসে দেখছি—আধখানা হয়ে গেছে, তিন ইঞ্চি সাইজের। তাহলে এর মধ্যে নিশ্চয়ই লোডশেডিং হয়ে গেছে, এতো বোঝাই যায়। তিন ইঞ্চি মোমবাতি তো কেউ খেয়ে ফেলতে পারে না।

ছোটপিসি বলে, হ্যাঁরে, তুই এতো কি করে লক্ষ্য করিস!

গুল্লুসের সংক্ষিপ্ত জবাব, কি জানি আমার চোখে পড়ে যায়। সত্যি এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, অনেক কিছু ওর চোখে পড়ে যায়, যা আমাদের চোখে পড়ে না।

ছোটপিসির বন্ধু বিপাশাদের বাড়ি হরিশ মুখুজ্জে রোডে। আর ছোটপিসির হঠাৎ হঠাৎ জরুরী কাজ পড়ে যায় ঐ বিপাশাদের বাড়িতেই। সাধারণত সে নিজেই ছোটে বিপাশাদের বাড়ি। কাজ ও গল্প দুইই হয়। সেদিন বোধহয় সে সুযোগ ছিল না। বনমালীকে বোঝাচ্ছিল—তোকে যেতে হবে ৩১ নম্বর হরিশ মুখুজ্জে রোড, বুঝেছিস ? ফটকঅলা দোতলা বাড়ি, বনমালী খুব হিসেবী লোক। সব জিনিস পুরোপুরি বুঝে নিতে চায়, সে বলল, আস্তার পুব দিকি, না পশ্চিম দিকি দিদিমণি !

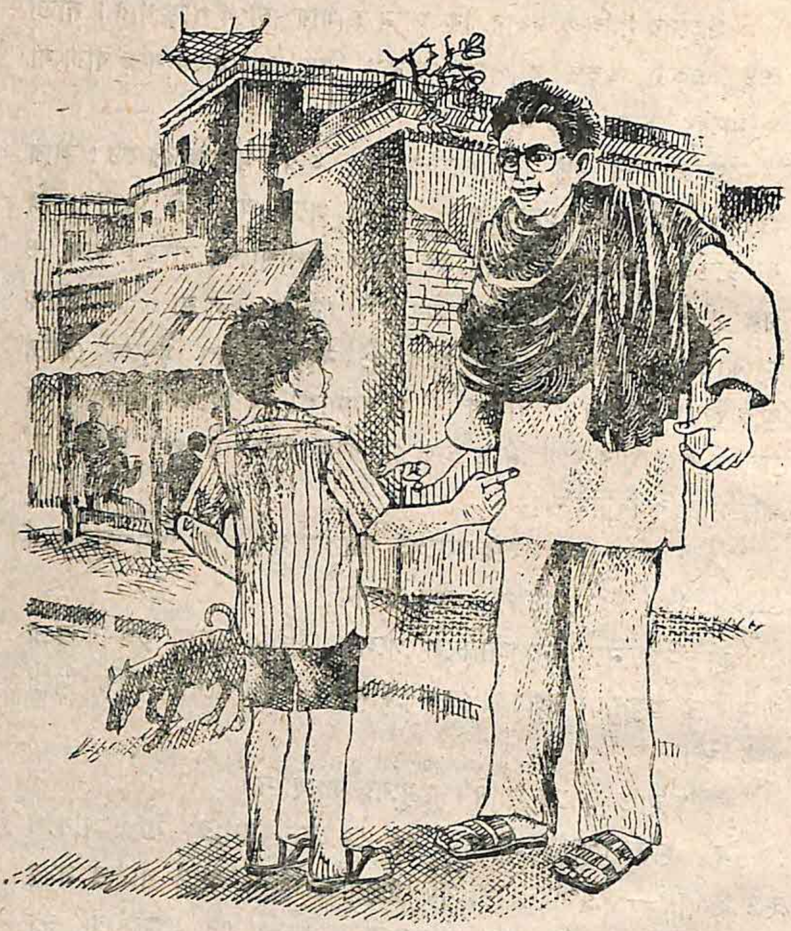
ছোটপিসি কিছু বলার আগেই গুল্লুস জবাব দিয়ে দিল তার হয়ে —পুবদিকি। কি, ছোটপিসি, ঠিক বলিনি ?

হাতচিঠি নিয়ে বনমালী চলে গেলে ছোটপিসি বলল, তুই কি করে জানলিরে গুল্লুস। তোকে তো কোনদিন বিপাশাদের বাড়ি নিয়ে যাই নি।

আমি হাত গুণতে জানি। গুল্লুসের মৃদু হাসি।

না, হাত গোণা টোনার মত কোনো ব্যাপারই না। আসলে হয়েছিল কি—কয়েকদিন আগেই গুল্লুস দোতলা বাসে যাবার সময় লক্ষ্য করেছে—নতুন কোনো রাস্তায় গিয়ে পড়লে এটা লক্ষ্য করা ওর বাতিকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে—হরিশ মুখুজ্জে রোডের সব জোড় নম্বরের বাড়িগুলো পশ্চিম দিকে, আর বিজোড় নম্বরের বাড়িগুলো পুব দিকে পড়ে। বিপাশা পিসিদের বাড়ির নম্বর ৩১। অতএব তা পুব দিকে না হয়েই যায় না। বনমালীর ভাষায় পুবদিকি।

একবার একেবারে এক অপরিচিত ভদ্রলোককে রাস্তায় ধরে গুল্লুস বলেছিল, আপনি নিশ্চয়ই কমলেশের কেউ হবেন। মামা বা পিসে বা মেসো।



ভদ্রলোক প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেন। তারপর অল্প হেসে বললেন, হ্যাঁ, আমি কমলেশের ছোটমামা, তুমি কি করে বুঝলে?

সকালে এই চাদরটাই পরে কমলেশকে ঘুরতে দেখেছি। গুল্লুস ভদ্রলোকের গায়ে জড়ানো শালটা দেখিয়ে দিল। আপনি কমলেশের দাদা বা কাকা হলে তো চিনতুমই। আপনি নিশ্চয়ই ওদের বাড়িতে এসেছেন।

ভদ্রলোক বললেন, বাঃ।

এরকম অনেক অনেক বাঃ গুল্লুস পেয়ে থাকে। বলতে দ্বিধা নেই আমিও ওর একজন ভক্ত। আসলে আমি গুল্লুসের ছোটকা পরিতোষের বন্ধু। গুল্লুস একবার পরিতোষের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে। আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে ওদের বসালুম।

খাটের ওপর বসতে বসতে গুল্লুস চারিদিকে বেশ করে তাকিয়ে দেখছিল। আমি ভেবেছিলুম, নতুন জায়গায় এলে বাচ্চা ছেলেরা সব কিছু কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে যেমন দেখে তেমনি বুঝি হবে। কিন্তু গুল্লুস খাটের ওপর বসে বড়দের মত গলায় বলল, এই খাটটা আর ঐ আলমারিটা কিছু দিন আগে জায়গা বদল করেছে, না?

সে আগে কখনো আসেনি আমাদের বাড়িতে, তার ছোটকা পরিতোষের সঙ্গে আজই প্রথম এল। আমার এ ঘর তার একেবারেই পরিচিত নয়। এ ঘরের আসবাবপত্র কোথায় কীভাবে থাকে বা ছিল তা তার জানার কথা নয়। আমার মত ওর ছোটকাও অবাক হয়ে গেল ওর কথায়। বলল, তুই কী করে জানলি রে?

আমি বললুম, কতদিন আগে বলো দেখি।

সে বলল, বেশিদিন হয়নি। হপ্তা দুয়েকের বেশি হবে না। মেঝেতে খাটের পায়ার সাদা দাগ এখনো বেশ স্পষ্ট।

ওর ছোটকা পরিতোষও আমার চেয়ে কম অবাক হয় নি। পরিতোষ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, মিলেছে নাকি?

একেবারে ঠিক। গত রোববারের আগের রোববারে সরিয়েছি খাটটা।

আমি আরও কিছু বলতে যাচ্ছি, গুল্লুস দুহাত তুলে বলল, দাঁড়ান দাঁড়ান, আমি বলে দিচ্ছি আলমারিটা ছিল এই জায়গায়।' সে নিজে উঠে এসে জায়গাটা দেখিয়ে দিল। তারপর বলল, 'ঠিক কি না, বলুন।'

আমি বললুম, 'বেশ তো মিলে যাচ্ছে।'

ওর ছোটকা বলল, 'হয়েছে হয়েছে। এবার গুল্লুস তুমি বাড়ির ভেতরে যাও দেখি, তোমার বন্ধু সংগ্রহ করে নাও।'

আমি পরিতোষকে থামিয়ে দিয়ে বললুম, 'উঁহু গুল্লুস বাবু, তুমি পরিতোষের কথা শুনো না, তুমি আমার কথা শোনো। তারপর কি যেন বলছিলে!'

উৎসাহিত গুল্লুস আবার শুরু করল, 'যা ছোট ঘর আপনার, এ ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না। আলমারি দিয়ে আপনি নিশ্চয়ই জানলা গার্ড করবেন না। অতএব—'

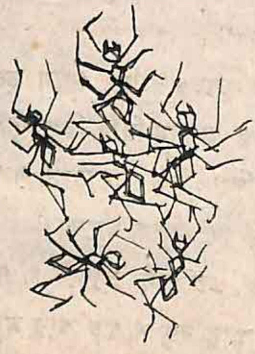
আমি গুল্লুসের দৃষ্টি, বিশ্লেষণ, বলবার ভঙ্গী সব কিছুতেই চমৎকৃত হচ্ছিলুম। তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে বললুম, 'আচ্ছা আরো কিছু বলোতো শুনি। কেন সরিয়েছি কিছু বলতে পারো?'

সে খানিক কি ভাবল; ঘরের দেওয়ালগুলো আবার বেশ করে নিরীক্ষণ করল। তারপর বলল, একটা কারণ অনুমান করছি। এখন বর্ষাকাল, আর আপনার এই দেওয়ালটা একটু ভিজে ভিজে দেখছি। আলমারির বইগুলো বাঁচাবার জন্যে আপনি এটা করে থাকতে পারেন। অন্য কারণ থাকতে পারে, ঠিক বলতে পারি না।'

যতক্ষণ গুল্লুস কথা বলছিল আমি তার দিকে শিশুর মত চোখে তাকিয়ে ছিলুম।

সেটাই সম্ভব। গুল্লুস এবার বেশ জোর দিয়ে বলল, ছোটকার মুখে শুনেছি, আপনার বইয়ের খুব যত্ন, আপনি বই খুব ভালবাসেন।

হিসেব কাঁটায় কাঁটায় মিলে যাওয়ায় আমি গুল্লুসকে কোলে তুলে নিলুম; যদিও কোলে তোলার বয়েস ও পার হয়ে এসেছে।



কোলে করার বয়েস অবশ্যই পার হয়েছে কিন্তু কতই বা বয়স ? দশ এগারোর বেশি হবে না। পরিতোষের মুখে ওর যা সব কীর্তি কাহিনী শুনি তাতে ওর দারুণ ভক্ত হয়ে পড়েছি। একবার ও ওর গুল্লুসীয় বুদ্ধি খাটিয়ে চমৎকার এক চোরা বামাল ধরে দিয়েছিল। ওর সেজকাকা কেষ্টনগর বেড়াতে গিয়ে এনেছিলেন এক কিলো সর-পুরিয়া। একেবারে খাঁটি জিনিস ; অর্ডার দিয়ে তৈরী করিয়ে এনে-ছিলেন সেজকাকা। তার সামান্য কিছু খাওয়া হয়েছিল তারপর সর-পুরিয়ার বাকসের অন্তর্ধান।

এখন কথা হচ্ছে কে এ কাজ করল। ময়না ঝিকে সন্দেহ করা যায় না, কেন না সে কাজ করে দিয়ে চলে যাবার পর সরপুরিয়ার বাকস খোলা হয়। সে সরপুরিয়ার বাকসের কথা জানেই না। বাকি থাকে বনমালী। কিন্তু কি একটা কাজে তাকে ভবানীপুরে ন'পিসিমার বাড়িতে পাঠানো হয়। এটা বোঝা যায় ঝি-চাকর নয়, বাড়ির কেউ এটি সরিয়েছে, কারণ সরপুরিয়ার বাকস তো পাখি নয় যে পাখা মেলে উড়ে যাবে।

কে সরিয়েছে, এই নিয়ে বেশ কিছু সোরগোল হল। পুলিশী ভাষায় যাকে বলে তল্লাসী চালানো, সারাদিন ধরে তাই করা হল। কোন ফল হল না।

মা বললেন, কে নিয়েছিস ; দিয়ে দে না বাপু। এতগুলো লোকের আশার জিনিস।'

কারো মুখ দিয়ে শব্দ বেরুল না।

রাঙ্গাপিসি সকলের মুখ স্টাডি করতে লেগে গেল। মুখেই তো মনের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু কোথায় প্রতিচ্ছবি ? সবাই চোর পুলিশ খেলার খেলোয়াড়দের মত হাসিহাসি মুখ করে রইল।

মা বললেন, যে নিয়েছে সে নিশ্চয় খুব পেটুক। তাকে আমি পাওনার চেয়ে দুটো বেশি সরপুরিয়া দেবো কথা দিচ্ছি।'

এরকম লোভনীয় পুরস্কার ঘোষণায়ও কোন কাজ হল না।

বাবা বললেন, 'যে নিয়েছ দিয়ে দাও বলছি, ধরা পড়লে কঠিন শাস্তি।'

নাঃ, চোরমহাশয় বড়ই নিপুণ ও দৃঢ়চিত্ত। সরপুরিয়া উদ্ধারের কোন আশা নেই।

সরপুরিয়ার শোক ভোলার পক্ষে এক রাতই যথেষ্ট। তার কথা সকলে বোধহয় ভুলেই গিয়েছিল। পরদিন খাবার টেবিলে গুল্লুস বিজয়ীর মত বলল, মা, এই নাও তোমার সরপুরিয়ার বাকস।

যারা খেতে শুরু করেছিল তারা খাওয়া বন্ধ করল এবং একগাদা সপ্রশংস দৃষ্টি গুল্লুসকে ঘিরে ধরল।

বাবা রসিকতা করে বলল, বাকস খালি করে ফেরত দিচ্ছ না তো?'

গুল্লুস বলল, 'মোটেই না। চোর ধীরে সুস্থে খাবে বলে রেখে দিয়েছিল।'

মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'চোর কে, আগে তাই বল।'

গুল্লুস বলল, 'গাবলুদা।'

গাবলু খাবার টেবিল ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল, যেমন ডিটেকটিভ গল্পের শেষ দৃশ্যে অপরাধীরা করে থাকে। তার পেছনে অবশ্য কেউ ধাওয়া করল না। কে করবে। সকলের চোখ তখন গুল্লুসের দিকে।

মা বললেন, 'কী করে ধরলি রে?'

গুল্লুস বলল, 'স্রেফ পিঁপড়েদের ফলো করে। দেখি পিঁপড়েরা ভাঁড়ার ঘর ছেড়ে সারিবদ্ধ চলেছে পড়ার ঘরের দিকে এবং গিয়ে উঠেছে গাবলুদার টেবিলের ড্রয়ারে।'

'ইউনিক।' ছোটকা লাফিয়ে উঠল, গুল্লুসটার দারুণ বুদ্ধি।

'শুধু পড়াশুনোর বেলায় খোলে না এই যা।' রাঙ্গাপিসি অনুযোগ করল।

এইখানে একটা কথা বলে রাখি। রাঙাপিসির কথাটা মোটেই সত্যি নয়। গুল্লুস পড়াশোনায় বেশ ভালো। আসলে রাঙাপিসি গুল্লুসকে খুব ভালোবাসে। রাঙাপিসির দারুণ দুঃখ গুল্লুস কোনো বারে ফার্স্ট হতে পারে না। সে প্রতিবারেই সেকেণ্ড থার্ড এই রকম হয়। তবে মাঝে মাঝে সে ফার্স্ট বয়েরও মাথা হেঁট করে দেয়। খুব কঠিন অংক যখন ক্লাসের কেউ পারে না তখন সে ঠিক তা কষে দেয়। জিনিসটা যেন একটা চ্যালেঞ্জের মত তার কাছে আসে, আর সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে বিশেষ এক ধরনের আনন্দ পায় সে। দেখা গেছে তখনই তার মাথা খোলে ভালো। বিশেষ করে জ্যামিতির একস্ট্রার বেলায়। কঠিন সমস্যায় ছাত্ররা তো বটেই, অংকের মাষ্টারমশায় পর্যন্ত যখন একটু চিন্তিত তখন গুল্লুসই সকলকে চমকে দিয়ে বলে ওঠে, 'স্যার এরকম করলে হয় না ?'

মাষ্টারমশায়ের মুখে মিষ্টি হাসি ফুটে ওঠে। তিনি মনে মনে বলেন, 'গুল্লুসটা মন দিয়ে লেখাপড়া করে না কেন ? করলে—'

ওর সহপাঠিদের কাছ থেকেই আমি এসব গল্প শুনেছি। আরো অনেক গল্প শুনেছি। তখন গুল্লুস আরো ছোট, ক্লাস ওয়ান-টোয়ানে পড়ে। অংকের মাস্টারমশাইকে বলেছিল, 'স্যার, ৯-এর নামতা মুখস্ত করার দরকার নেই।'

মাস্টারমশাই কিছু বুঝতে না পেরে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, 'তার মানে ?'

গুল্লুস বলেছিল, '৯কে ভেঙ্গে সাজিয়ে নিলেই ৯-এর নামতা পাওয়া যায়।'

মাস্টারমশায় চশমাটা বরাবর কপালে রাখতেন। তিনি সেটা নাকের ওপর নামিয়ে এনে বলেছিলেন, 'কী রকম ?'

তখন গুল্লুস খড়ি দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে এইভাবে লিখে দিয়েছিল ৯-এর নামতা মনে রাখার সহজ পদ্ধতি।

১×৯=৯ বা ০+৯=৯
২×৯=১৮ বা ১+৮=৯
৩×৯=২৭ বা ২+৭=৯
৪×৯=৩৬ বা ৩+৬=৯
৫×৯=৪৫ বা ৪+৫=৯
৬×৯=৫৪ বা ৫+৪=৯
৭×৯=৬৩ বা ৬+৩=৯
৮×৯=৭২ বা ৭+২=৯
৯×৯=৮১ বা ৮+১=৯
১০×৯=৯০ বা ৯+০=৯

বলা যায় এটা গুল্লুসের আবিষ্কার। কিন্তু তার এ আবিষ্কারের কে মূল্য দেবে ? ওর বাড়ির লোকেরা ? ওকে নিয়ে কেবল দুঃখই করে। গুল্লুস কেন একবারও ক্লাসের পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পারে না।

কোন বার সে ফার্স্ট হতে পারে না এজন্যে গুল্লুসের নিজের কোন দুঃখ আছে বলে মনে হয় না। ওর বয়েসী ছেলেরা পরীক্ষার ব্যাপারে কত চিন্তিত হয়, কিন্তু কবে ওর পরীক্ষা আসে কবে শেষ হয় কেউ টেরই পায় না। এজন্যে আমি ওকে ভীষণ পছন্দ করি। সেও আমাকে বিশেষ পছন্দ করে। ও আমাকে প্রায়ই বলে, 'জানেন কাকা, আমি একদিন সরযূ নদীর তীরে প্রাচীন অযোধ্যা নগরী খুঁজে বার করব।'

আমি যত বলি, 'অযোধ্যা ? মানে দশরথের রাজধানী ? সে তো পৌরাণিক ব্যাপার, সে কি সত্যি ?'

গুল্লুস বলে, 'আপনিও হাসছেন ? আমাদের ইতিহাসের মাস্টারমশাই হেসেছেন। কিন্তু আমি বলে রাখছি অযোধ্যা নগরী একদিন আমি খুঁজে বার করবই !'

আমি হেসে ওকে বলেছি, 'কেমন করে খুঁজে বের করবে তার কিছু প্ল্যান করেছ ?'

গুল্লুস বলে 'একটা সূত্র তো হাতে রয়েছে।'

'সূত্র ?'

'হ্যাঁ, স্বর্ণসীতা। সীতার সেই সোনার মূর্তিটা যাবে কোথায় ? সেটা নিশ্চয়ই রয়ে গেছে উত্তর প্রদেশের কোনো প্রাচীন দেবালয়ের গোপন ঘরে। হয়তো কোনো শিবলিঙ্গ বা দেবী মূর্তির বেদীর তলায়। যেখানেই থাক আমি উত্তর প্রদেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াবো, খুঁজে বার করব সেই স্বর্ণসীতা। সেটা যদি একবার পাওয়া যায়, তার সঙ্গে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে কিছু কাগজপত্র। ব্যস, তাহলেই সেই কাগজপত্র ধরে আমরা পৌঁছে যাবো সেকালের অযোধ্যা নগরীতে, অবশ্য সেটা এখন মাটির তলায়, খুঁড়ে বের করতে হবে।'

এর পরে আমি আর হাসিনি। আমি সত্যিই গুল্লুসের কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তি দেখে মাঝে মাঝে চমৎকৃত হয়ে যাই। প্রাচীন অযোধ্যা নগরী সে একদিন আবিষ্কার করতে পারবে কিনা জানি না, কিন্তু সরপুরিয়ার বাকসটা তো সে খুঁজে বার করেছে। এটাতো সত্যি।

গুল্লুসের একমাত্র দুঃখ এই সবাই তার বুদ্ধি কল্পনার প্রশংসা করে, শুধু তার নিজের বাড়ির লোকেরা ছাড়া। তবে দুঃখ করে লাভ নেই, বাড়ির লোকেরা এইরকমই হয়। ওর মা অবশ্য দুটো আস্ত সরপুরিয়া দিয়েছিলেন গুল্লুসকে তার সফল গোয়েন্দাগিরির দক্ষিণা হিসাবে। আমি কিন্তু জানি (এবং হয়তো একমাত্র আমিই জানি) দক্ষিণার জন্যে গুল্লুস মোটেই লালায়িত নয়। তার বুদ্ধি নিজস্ব পথে খেলা করতে ভালোবাসে। এতেই তার আনন্দ। সমস্যা সমাধানে তার আনন্দ। অন্যের বিপদ তারণে তার আনন্দ। প্রশংসার জন্যে সে মোটেই লালায়িত নয়। কদিন পরেই যে ঘটনা ঘটল তা যদি বলি তাহলেই বুঝতে পারবে গুল্লুস কী ধরনের ছেলে। ঘটনাটা এই রকম।



স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এক শনিবারে গুল্লুস এক নিদারুণ দুঃসংবাদ পেল। তার প্রিয় ছোটকাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ির বড়রা মহা দুর্ভাবনায় পড়ে গেছে। সতেরো আঠারো বছরের কলেজে পড়া ছেলে হারিয়ে যাবার নয়। আগেকার দিনে অবশ্য ঐ বয়সেই ছেলেরা সন্ন্যাসী হয়ে যেত। কিন্তু আজকাল নিরুদ্দেশ-টিরুদ্দেশ কেউ বড় একটা হয় না। নিশ্চয়ই কে বা কারা তাকে ধরে নিয়ে গেছে।

তবু অনেকেই পুরোনো ধারণা নিয়ে বসে আছে। কেউ বলেছে 'তীর্থটীর্থগুলো একবার খুঁজে দেখো।' কেউ বলছে পরীক্ষায় ফেলটেল করেনি তো? আবার কেউ বলছে, এখানে খুঁজে কী হবে, বোম্বে গিয়ে খোঁজ।'

হাতের বই হাতেই রইল, সত্য স্কুল ফেরৎ গুল্লুস বলল, 'আমাকে খবর দাওনি কেন?'

সকলে গুল্লুসের দিকে একটু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতেই ফিরে তাকাল 'তুই ছেলেমানুষ, তুই কী করবি?'

গুল্লুস ভীষণ অপমানিত বোধ করল। তার কিছুটা রাগ এবং দুঃখ হল। এই সেদিন সরপুরিয়ার বাকস উদ্ধার করে দিল সে। এরই মধ্যে ভুলে গেল সবাই। এই জন্যেই বিদ্যাসাগর মশাই বলে গেছেন কারো উপকার করো না। তার চোখে জল আসছিল, কিন্তু সে সামলে নিল, এখন কাঁদার সময় নয়। সে মুখে কাউকে কিছু বলল না, মনে মনে সংকল্প করল ছোটকাকে খুঁজে বের করতে হবে।

ছোটকা যে সন্ন্যাসী হয়ে যায় নি সে ব্যাপারে গুল্লুস একেবারে নিশ্চিত। ছোটকা বিজ্ঞানের ছাত্র, পরশুরামের বিরিঞ্চিবাবা গল্পটার পরম ভক্ত। কতবার যে গল্পটা সে ছোটকার মুখ থেকে শুনেছে। প্রত্যেকবার বলবার সময় ছোটকা হেসে কুটো পাটি হয়েছে। এই লোক কখনো সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারে!

রাগ করে আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুদের বাড়ি গিয়ে বসে আছে সে সম্ভাবনাও নেই। কারণ রাগারাগির কোন ঘটনা ঘটেনি সম্প্রতি। তার

ওপর আত্মীয়দের ও বন্ধুদের বাড়ি ইতিমধ্যেই খবর নেওয়া হয়ে গেছে।

অনেকে বাড়ি থেকে পালিয়ে বম্বে চলে যায়। কিন্তু এমন কথাও ভাবা যায় না। কারণ সেরকম মতিগতিই নয় ছোটকার। তাছাড়া বম্বে যাবার ভাড়াটা অন্তত সে নিয়ে যেত, বাড়ি থেকে কোন টাকা পয়সা বা সোনার জিনিস ছোটকা নিয়ে যায় নি। এই সব তথ্য মনে মনে বিশ্লেষণ করে গুল্লুস চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল—তার ছোটকাকে কে বা কারা ধরে নিয়ে গেছে।

সে যখন চুপচাপ সিঁড়িতে বসে এই সব ভাবছে, রাঙ্গাপিসি এসে বলল, 'তুই এমন চুপচাপ বসে কেন রে? মন খারাপ করিস নি, যা খেলগে যা।

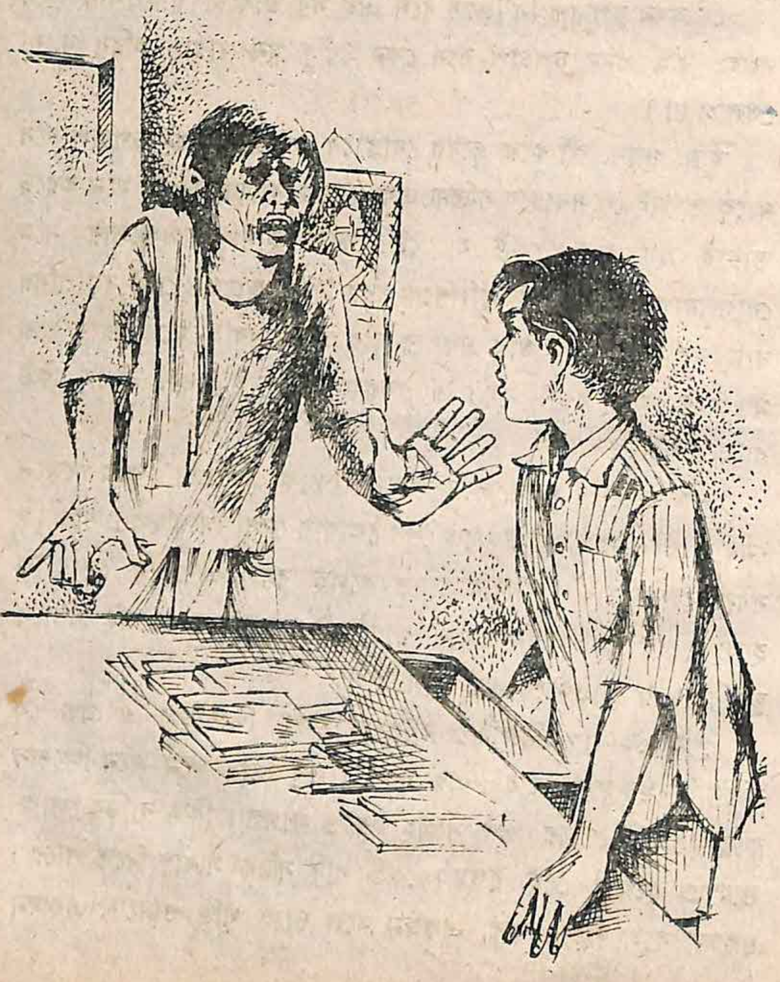
হায়, গুল্লুস কী করে এদের বোঝাবে গোয়েন্দা যখন চুপচাপ বসে থাকে তখনই সে সবচেয়ে সক্রিয় এবং ব্যস্ত। বাড়ির সবাই মনে করছে তারাই শুধু ব্যস্ত। কেউ বা টেলিফোনে হাসপাতালগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করছে। কেউ পুলিশকে খবর দিতে ছুটছে। কেউ বড়পিসির বাড়ি বরানগর থেকে আর একবার ঘুরে এল। সবাই মনে করছে তার মত ব্যস্ত আর কেউ নয়। এ একরকম ভালোই। তার কাজে কেউ ব্যাঘাত ঘটাবে না।

এক ফাঁকে গুল্লুস জনে জনে ডেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবার চেষ্টা করল, ছোটকাকে শেষ কোথায় দেখা গিয়েছিল। তাও কি সবাই বলতে চায়? ন'কাকিমা তো বলেই বসল, এ জেনে তোর কি হবে? তোর ছোটকা কি এখনো সেখানেই বসে আছে যে তুই সেখানে ছুটবি তোর ছোটকাকে ধরে আনতে?

শেষ কোথায় নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে দেখা গিয়েছিল এ প্রশ্ন যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা যদি এরা বুঝত। তবু গুল্লুস জনে জনে জিজ্ঞেস করে যতখানি পারে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগল। কিন্তু বাড়ির লোক-গুলোও হয়েছে সেই রকম। কেউ যদি সঠিক সংবাদ দিতে পারে। একজন বলে পড়ার ঘরে, একজন বলে ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে, একজন

বলে কাফে হ্য তিলজলায়। কিন্তু একই সময় একজন মানুষের পক্ষে তিন জায়গায় থাকা সম্ভব নয়। আসলে কেউ সঠিক কিছু জানে না। তা সেকথা স্বীকার করলেই হয়।

সময় নষ্ট না করে গুল্লুস সোজা চলে এল ছোটকার পড়ার টেবিলে। ঘরে ঢুকেই অবশ্য ভেতর থেকে দরজার ছিটকিনি এঁটে দিল। কেউ টের পেলে চলবে না। ছোটকার নিরুদ্দেশের কেসটা হাতে নিয়েছে, ছোটকাকে উদ্ধারের আগে কেউ যেন তা জানতে না পারে।



তার গতিবিধি আর কাজের সন্ধান কেউ পাবে না এইটাই নিয়ম। এক্ষুণি হয়ত বনমালী আসবে ঘর পরিষ্কার করতে। তার আগেই শেষ করে ফেলতে হবে খোঁজা খুঁজির পালা।

গুল্লুস তন্ন তন্ন করে খুঁজল, এ ড্রয়ার সে ড্রয়ার টেনে দেখল, টেবলক্লথটাও উল্টে দেখল একবার, যদি কোন চিঠি-টিঠি পাওয়া যায়! ছোটকার লেখা বা ছোটকাকে লেখা কোন চিঠি। না, সে রকম কিচ্ছু নেই।

সে প্রথম ড্রয়ারটা আর একবার নতুন করে খুঁজতে যাবে এমন সময় দরজায় ঘা পড়ল। নিশ্চয়ই বনমালী ঘর পরিষ্কার করতে এসেছে। দ্রুত হাতে সব কিছু ঠিকঠাক গোছগাছ করে সে দরজা খুলে দিল। বনমালী পড়ার ঘরে ঢুকে অসময়ে গুল্লুসকে দেখে একটু অবাক হল। সে বলল, দাদাবাবু যে। দরজা বন্ধ করে কী করতিছিলে? আমি সেই থেকে ডাকতিচি।

সে কথার জবাব না দিয়ে গুল্লুস বলল কালো রংয়ের ফাউন্টেন পেনটা খুঁজে পাচ্ছি না, দেখেছিস?

ফাউন্টেন পেন তো সত্যিই হারায় নি। তাছাড়া ফাউন্টেন পেনের ব্যাপার বনমালীর জানার কথা নয়। সে ঘাবড়ে গিয়ে বলল, আমি তো ভবানীপুরের পিসিমার বাড়ি থেকে এই আসতিচি।

গুল্লুস কৃত্রিম বিরক্তির ভাব মুখে ফুটিয়ে বলল, আরে আমি বলেছি না কি তুই নিয়েছিস? দেখেছিস কি না তাই বল।'

আমি কি তোমাদের মতো ন্যাকাপড়া জানি? বনমালী নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগল।

আরে বাবা। লেখাপড়া জানার কথা কে তোকে বলেছে। তুই ফাউন্টেন পেনটা দেখেছিস কি না, তাই বল।'

এবার বনমালী প্রায় কেঁদে ফেলে। হাতের ঝাঁটা ফেলে দিয়ে সে বলল, আমি যাচ্ছি মেজোমাকে বলতে। আমি কিছুটি জানি নি, শুধু মুধু আমারে দোষ দিতিছে।

নতুন বিপদের সম্ভাবনা দেখে গুল্লুস বলল, ঠিক আছে। ঠিক আছে। দেখিস নি তা বললেই তো হয়। এই বলে তাড়াতাড়ি গুল্লুস পড়ার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বাইরে এসে আবার সিঁড়ির ওপর বসল। এই জায়গাটা তার প্রিয়। তা ছাড়া এখানে বসলে কত কথা আপনা আপনি মনে জাগে। অল্পেই যে রকম ঘাবড়ে গিয়েছিল তাতে মনে হয় বনমালীটা একটা ভিজে বেড়াল। ওর সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। কিন্তু এগোবার মত কিছুই তো পাওয়া গেল না। এখন কী করা যায় !

ভেতরে প্রচণ্ড অস্বস্তি। অথচ কিছুই সে করতে পারছে না। চিন্তাকুল গুল্লুস এবার বাথরুমে ঢুকল। বাথরুমটাই তার একমনে চিন্তা করার জায়গা। এই বাথরুম থেকেই সে কত সময় কত যে নতুন আইডিয়া পেয়েছে। সেবারে যখন লুডো খেলার কলকেটা হারিয়ে গেল এই বাথরুমে ঢুকেই তার মনে হয়েছিল, ন' কাকিমার খালি এসেন্সের শিশির অতি লম্বা ধরনের প্লাস্টিকের ছিপিটা চমৎকার কলকে হতে পারে। শেষ পর্যন্ত হলও তাই। তাই দিয়ে তো এখনো বেশ লুডো খেলা চলে যাচ্ছে। বাথরুমের দেয়ালে কত রকমের দাগদোগ, এদের ইতিহাস জানা যায় না। এমন দাগও থাকে যা থেকে অনায়াসে একটা বুড়োর মুখ কি সিংহ বানিয়ে দেওয়া যায়। গুল্লুসের এসব দেখতে ভালো লাগে। একটা স্যাঁতাপড়া দাগকে বাংলা সংখ্যা ৬ বলে মনে হয়। ওর মাথার ওপর হাল্কা দাগটা ধরলে ওটা ড বলে ধরা যায়। তারপর ডানপাশে যে লাইনটা দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না সেটা ধরলে তো ড আবার ডা হয়ে যায়। অনেকক্ষণ ধরে সে তার বানানো ডা-এর দিকে তাকিয়ে রইল ! হঠাৎ তার মাথায় বিদ্যুৎ চমকের মত খেলে গেল ছোটকা ডায়েরি লিখত।

কোথায় গেল সেই ডায়েরি ? বাড়িতে থাকলে ছোটকা বইপত্তরে হাত ছোঁয়াতে দিত না। কিন্তু এখন সে ভয় নেই। গুল্লুস ছোটকার বই পত্তর ওলট পালট করে একেবারে তছনছ করে ফেলল। অবশ্য

এবারও দরজায় ছিটকিনি আঁটতে ভুলল না। কি জানি, কেউ যদি এসে পড়ে। ছোটকাকে না খুঁজে তার বইপত্তর খুঁজছি দেখে তারা অবাক হবে। তারা তো আর জানে না, ছোটকাকে খুঁজে বের করার জন্যেই তার বইপত্র খোঁজা দরকার।

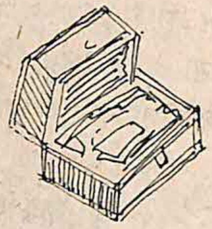
একটা করে বই উল্টে ফেলে আর গুল্লুস মনে মনে বলে, রাগ কোরো না ছোটকা। তোমার প্রাণের চেয়েও তো আর তোমার বই-পত্তর বড় নয়। তোমাকে উদ্ধারের প্রথম ধাপ তোমার ডায়েরি উদ্ধার।

নীল রঙের মলাট দেওয়া ছোটকার সেই ডায়েরিটা গেল কোথায় ? চুরি করল নাকি শত্রুপক্ষের লোকেরা ? কিছুই বিচিত্র নয়। শত্রুপক্ষের কোন লোক যে এই বাড়িতেই লুকিয়ে নেই তাই বা কে বলতে পারে ! অন্তত সে সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এমনও হতে পারে ভিজে বেড়াল বনমালীই শত্রুপক্ষের লোক। দলের নির্দেশে ছোটকার ডায়েরী ইতিমধ্যেই লোপাট করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত হয়তো বনমালীর ভাঙ্গা টিনের বাক্স সার্চ করতে হতে পারে। কিন্তু সে জিনিস কি আর এতক্ষণ সেখানে আছে, কখন পাচার হয়ে গেছে যথাস্থানে। আর ধরো যদি সেখানেই মিলে যায় ছোটকার ডায়েরী, তাহলে ? তাহলে তো হয়েই গেল মুস্কিল আসান—বনমালীর সূত্র ধরেই এগোতে হবে। চেপে ধরলেই তার মুখ থেকে ফাঁস হয়ে যাবে অনেক গোপন কথা। ছোটকাকে খুঁজে বের করা তো তখন কিছুই নয়। এত সহজে মুস্কিল আসান। যাঃ এসব সে কী ভাবছে !

কিন্তু গেল কোথায় সেই ডায়েরীটা যার মলাটটাই সে শুধু চোখে দেখেছে, কোনদিন হাত দেবার সাহস পায়নি। ছোটকার সঙ্গে কি সেটাও হাওয়া ? তাহলে কি বুঝতে হবে না, এ দুয়ের মধ্যে যোগাযোগ আছে। আর তাই যদি হয়, বনমালীকে সন্দেহ না করে উপায় আছে ? গুল্লুস আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে বনমালীর আস্তানার দিকে এগোলো।

বনমালী থাকে সিঁড়ির তলায় প্রায় ঘর-মতো জায়গাটায়। সেখানেই থাকে তার গোটানো বিছানা এবং যাবতীয় সম্পত্তি। শুধু চুরি যাবে



এই ভয়ে টাকাকড়ি কিছু সে ওখানে রাখে না। তার টাকাকড়ি থাকে গুল্লুসের মায়ের কাছে। দেশে যাবার আগে সে চেয়ে নিয়ে যায়।

গুল্লুস প্রথমে দেখে নিল, বনমালী তার সিঁড়ির ঘরে আছে কি না। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করল, মা বনমালী কোথায় গেল?

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, এই তো ছিল এখানে কোথায় গেল আবার?

রাঙ্গাপিসি বলল, আমি তাকে বাজারে পাঠিয়েছি। কিছুই তো নেই ঘরে। খাওয়া দাওয়া তো করতে হবে। নাকি হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদলেই চলবে। তারপর রাঙ্গাপিসি গুল্লুসের দিকে ফিরে বলল, কেন, তোর আবার বনমালীকে কি দরকার?

গুল্লুস থতমত খেয়ে বলল, না, এমনি। দেখতে পাচ্ছি না কিনা।

সেখান থেকে সোজা চলে এল সে বনমালীর সিঁড়ির ঘরে। বনমালী বাজারে গেছে, এই সুযোগে ওর টিনের বাক্সটি খুলতে যাবে এমন সময় রাঙ্গাপিসি বলল, তুই সিঁড়ির তলায় কি করছিস রে?

গুল্লুস পাকা অভিনেতার মত বলল, রবারের বলটা এদিকে কোথায় যে এলো!

রাঙ্গাপিসি সিঁড়ি দিয়ে ওপরের ঘরে যেতেই সে তাড়াতাড়ি খুলে ফেলল বনমালীর টিনের বাক্স। তার থেকে বেরিয়ে পড়ল সেফটিফিন, ছুঁচ, গুলির সুতো, মলমের কৌটো এবং আরও কিছু ফেলে দেওয়া টুকিটাকি, কিন্তু কোথায় ছোটকার সেই ডায়েরি!

টিনের বাক্স থেকে মাথা তুলতেই গুল্লুস দেখে ড্যাবা ড্যাবা চোখে

তাকিয়ে আছে বনমালী। সে কখন এর মধ্যে বাজার থেকে ফিরে এসেছে। বনমালী অনুযোগের সুরে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, তুমি আমার বাক্স ঘাঁটতিছ দাদাবাবু।

বেশ খানিকটা রাগের ভাব দেখিয়ে গুল্লুস বলল, বেশ করতেছি। তুই আমার ফাউন্টেন পেন নিয়েছিস কি না তাই দেখছি।

সেই কখন থেকে বলতিচি আমি তোমার ফাউণ্টেন পিন নিই নি। বনমালী প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি।

নিস নি বেশ করেছিস। গুল্লুস সেখান থেকে রাগ দেখিয়ে হুড়-মুড়িয়ে চলে এলো। বনমালী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার রকম দেখে। দাদাবাবুর আজ হয়েছেটা কি, কোনদিন তো এ্যামনটা করে না। সত্যি যেন গুল্লুসের কি হয়েছে। তার মনে এখন কী গভীর চিন্তা, বনমালী তার কী খবর রাখবে! অন্যমনস্ক হয়ে ছুটে আসতে গিয়ে নতুন কেনা বইয়ের স্ট্যাণ্ডটা কাত হয়ে পড়ল। ছড়িয়ে পড়ল সারিবদ্ধ রবীন্দ্ররচনাবলী আর তারই আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়ল ছোটকার সেই নীল ডায়েরি।

গুল্লুসের বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। ছোটকার নিজের ডায়েরি ছোটকার মনের খবর কর্মকাণ্ড সব এতে লেখা থাকে। অতএব এ থেকে কিছু না কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবেই। আর একটা কথাও তার মনে হল, বনমালীর সম্ভবত শত্রুপক্ষের সঙ্গে কোন যোগ নেই। তাকে আর সন্দেহভাজন বলা যায় না।

জামার মধ্যে লুকিয়ে ডায়েরি নিয়ে সে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। একবার ভাবল চিলেকোঠার ছাতে চলে যায়। তারপর মনে হল, ছাতে কেউ না কেউ কাপড় তুলতে কি কাপড় মেলতে আসবেই। থাক, তার চেয়ে পড়ার টেবিলে বসা যাক। উঁহু, অসময়ে পড়তে বসেছি দেখলে অনেকের সন্দেহ জাগতে পারে। তার চেয়ে—সে টেনে নিল একটা গল্পের বই। হ্যাঁ বইটার আড়ালে—সেই ভাল। ঘেরা বারান্দার সেই বিশেষ জায়গাটায় মেঝের ওপর সে বসে পড়ল। বলা যায় এটা তার

গল্পের বই পড়ার বিশেষ জায়গা। এখানে বসে গল্প পড়লে সে বেশি সুখ পায়। এখানে বসে গল্পের বইয়ের আড়ালে গুল্লুস পড়তে লাগল ছোটকার ডায়েরি।

যা ভেবেছে তাই। একটু পরে রাঙাপিসি এসে বলল, কি রে গল্পের বই পড়ছিস ? তা বেশ। সব সময় পড়ার বই পড়া ভালো নয়। এই জন্যে গুল্লুসের রাঙাপিসিকে ভালো লাগে। বেশ বিবেচক। বিবেচক, কিন্তু একটুও নরম প্রকৃতির নয়, বেশ শক্ত ধরনের। রাঙাপিসি ছেলে হয়ে জন্মালেই বোধ হয় ভালো হত।

ছোটকার জন্যে বাড়িশুদ্ধ লোকের মন খারাপ, আর রাঙাপিসি যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গুল্লুস বলল, সত্যি রাঙাপিসি, ছোটকার কী হল বলো তো ?

—কী আবার হবে ! খিদে পেলে ঠিক বাড়ি এসে ঢুকবে। তুই যেন আবার মন খারাপ করিস নি।

গুল্লুস বলল, নাঃ, মন খারাপ করব কেন।

রাঙাপিসি গুল্লুসের গাল টিপে আদর করে গেল। গুল্লুস আবার গল্পের বইয়ের আড়ালে ছোটকার ডায়েরি পড়তে শুরু করল। একবার শুরু করলে আর ছাড়া যায় না এমন লেখা। ছোটকা যে এত সব ভাবে তা তার জানা ছিল না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু পড়ে ফেলল সে। মনে মনে বলল, ছোটকা রাগ করো না তোমার মনের কথা পড়ে ফেললুম বলে। এ সবই তোমার প্রাণের জন্যে। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করবে।

বেশ লাগল পড়তে, অনেকটা গল্পের বইয়ের মতই। কত লোকের সম্বন্ধে কত ভালো মন্দ মন্তব্য, তবে বেশির ভাগটাই ছোটকার নিজের সম্বন্ধে। এর মধ্যে আবার গত অক্টোবরের কয়েকটা দিনের ঘটনাই তার কাছে বেশি দরকারী বলে মনে হল। এক জায়গায় লিখেছে ঃ ঝগড়াঝাঁটি ভালবাসি না, অথচ দেখ ঝগড়াঝাঁটি ঠিক ঘাড়ে এসে পড়বেই। ভালো লাগে না একটুও। আর এক জায়গায় লিখেছে ও,

25.1.2011
14479

নতি-স্বীকার ? কিছুতেই না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, দু বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না।

পড়তে পড়তে ছোটকা-গর্বে গুল্লুসের বুক ফুলে উঠছিল। পুজোর চাঁদা আদায় ব্যাপারে লাইনের ওপারের ছেলেদের সঙ্গে ছোটকার ঝগড়াঝাঁটি চলছিল বোঝা যায়। ঠিক কাদের সঙ্গে ঝগড়া বোঝবার উপায় নেই, কেন না ছোটকা একটি লোকেরও নাম উল্লেখ করে নি। তা হোক, 'লাইনের ওপার, এটুকু তথ্য তো পাওয়া গেল। আপাতত এই যথেষ্ট।

অবিশ্যি ডায়েরি থেকে আরও কিছু তথ্য পাবার আশা করেছিল সে। পাওয়া গেল না, তা আর কি করা যাবে। সে ডায়েরিটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল।

পেছনের মলাটে পর পর তিনবার খেয়ালবশে লেখা : শ-স, শ-স, শ-স। প্রতিবারই আণ্ডারলাইন করা। কী হতে পারে এর মানে ? এ কি শুধুই খেয়ালবশত লেখা ? না কি অন্য কিছু ? একজন মনস্তাত্ত্বিককে কাছে পেলে ভালো হত এই সময়। কিন্তু মনে মনে ইচ্ছে করলেই তো আর মনস্তাত্ত্বিক এসে হাজির হবে না।

গুল্লুস শুধু মনস্তত্ত্ব নামটাই শুনেছে, কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই তার মন বলল, শ-স নিশ্চয়ই ছোটকার খুব প্রিয়জন অথবা মারাত্মক শত্রু, নইলে কলমের মুখে তার নামটাই বা বেরিয়ে আসবে কেন ? ছোটকার প্রিয়জন বলতে প্রথমেই শর্বরীর কথা মনে হল। ছোটকার কাছে অঙ্ক বুঝে নিতে আসে, ছোটকার ভারি পছন্দ ওকে। গুল্লুস ভাবল শর্বরীর কাছে গেলে হয়তো ছোটকার কোন খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু না, তা কি করে হবে ? শর্বরী যে সমীর কাকুর বোন, আর সমীরকাকুরা যে 'দত্ত'। অথচ ডায়েরির মলাটের কোণায় যে পরিষ্কার লেখা : শ-স শ-স, শ-স।

তবে কি এই শ-স ছোটকার কোন শত্রু হবে ! স্পষ্ট বোঝা যায় এই শ-সকে নিয়ে ছোটকা বেশ ভাবনায় ছিল। নইলে মানুষ শুধু শুধু

একই নাম বার বার তিনবার লিখত না। অতি ক্ষীণ সূত্র। তবু এই সূত্র ধরেই এগোতে হবে।

রাঙাপিসি আবার ওপর থেকে নেমে এল, কি রে তুই এখনো তোর ছোটকার জন্যে মন খারাপ করে বসে আছিস। পাগল ছেলে! দেখিস, আজকের মধ্যেই ঠিক তোর ছোটকাকে পাওয়া যাবে।

গুল্লুস মনে মনে বলল, তাই যেন পাওয়া যায়। তারপরই সে উঠে পড়ল। আর এক মিনিটও সময় নষ্ট করলে চলবে না। এক মিনিটের জন্যে অনেকটাই এদিক ওদিক হয়ে যেতে পারে। তার মনের মধ্যে আসা যাওয়া করতে লাগল দুটি বাংলা অক্ষর—'শ' ও 'স'।



লাইনের ওপাশটায় বেশীদূর গুল্লুস কোনদিনই যায়নি। কারখানা, ধোঁয়া, খানাখন্দ, বস্তী, পাঁচিলে ঘুঁটে, ভূতের মত চেহারার সেকেলে ল্যাম্পপোষ্ট, সব মিলিয়ে কেমন যেন ভৌতিক রহস্যময় সব। ভয় ভয় করে। কিন্তু আজকে বিপদের মুখে তার সব ভয় কোথায় চলে গেছে।

লেভেল ক্রশিং পার হয়ে গুল্লুস এগিয়ে চলল। কিছুদূর যেতেই তার সঙ্গে বনমালীর দেখা। তবে কি বনমালী তাকে ছায়ার মত আগাগোড়া অনুসরণ করে চলেছে! তবে কি বনমালী সত্যিই শত্রুপক্ষের লোক! সন্দেহভাজনদের লিস্ট থেকে সে বনমালীর নাম কেটে দিয়েছিল। আবার সে তার নাম লিস্টে তুলল।

বনমালী তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, তুমি ইদিক পানে যে দাদাবাবু?

গুল্লুসের একবার মনে হল বলে, বেশ করেছি এদিকে এসেছি। তোর তাতে কি। কিন্তু সে কথা না বলে সে বলল, তার আগে বল তুই এদিকে কী করতে এসেছিস?

ইদিকেই যে আমার পিসির বাড়ি গো। বনমালী বলল, পিসির যায় যায় অবস্থা। তাই ওজই একবার করে দেখে যাই দোপর বেলাটায়।

সত্যি বলছিস ?

মিথ্যে কেন বলতে যাবো দাদাবাবু। এই দেহো না ওষুধের শিশি। ওষুধ ফুইরেচে আবার।

সত্যিই বনমালীর হাতে-ধরা একটা ওষুধের শিশি গুল্লুসের চোখে পড়ে। তবু বিশ্বাস নেই, শত্রুপক্ষের লোক হলে এটুকু ভান সে অনায়াসে করতে পারে। গুল্লুস বনমালীর আপাদমস্তক আর একবার ভালো করে পরীক্ষা করে নেয়। সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পায় না। সেই পুরাতন বনমালী—বোকা বোকা সরল প্রকৃতির একটা মানুষ।

এবার বনমালী গুল্লুসকে প্রশ্ন করে, তা তুমি ইদিক পানে কেন তা তো বললে না ?

গুল্লুসের একবার মনে হল, বলে, তোকে বলতে যাবো কেন। তারপর মনে হল কিছু একটা বানিয়ে বলাই ভালো। নইলে বাড়িতে গিয়ে সাতখানা করে লাগাবে—ছোড়দাবাবুকে দেখলুম লাইনের ওপারে ঘোরাঘুরি করতে। তখন আবার বাড়ির সবাই ছোটকাকে ছেড়ে গুল্লুসকেই খুঁজতে বেরিয়ে পড়বে। সে এক ভারি বিশ্রী ব্যাপার হবে। তার ছোটকা-উদ্ধার অভিযান একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

গুল্লুস বানিয়ে বলল, আমি যাচ্ছি বন্ধুর বাড়ি অংকের বই চাইতে। আসলে এদিকটায় তার কোন বন্ধুই নেই।

বনমালী যেন সন্দেহ করেছে গুল্লুসের কথায় এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তাই দেখে গুল্লুস মেজাজের সুরে বলল, যা, দাঁড়িয়ে রইলি কেন আবার ! বাড়ি যা।

যাচ্ছি, বলে বনমালী বাড়ির পথ ধরল।

বনমালী পেছন ফিরতেই গুল্লুস কাছাকাছি একটা বাড়ির থামের আড়ালে গিয়ে লুকোলো। উদ্দেশ্য, বনমালী সত্যিই বাড়ী ফিরে যায় কি না তা দেখে নেওয়া। সে যা ভেবেছে ঠিক তাই। কিছুদূর গিয়েই

বনমালী আবার ফিরে আসছে। তড়াক করে লাফিয়ে গুল্লুস আবার রাস্তায় নেমে দাঁড়ায়। বনমালীর মতলব ভালো নয়।

—কি রে ফিরে এলি যে বড় ?

—না দিন কাল ভালো নয়। তাই বলতে এলুম সকাল সকাল বাড়ি ফিরে এসো গো ছোটদাবাবু। একজন তো সেই যে গেল আর ফিরলোনা।

গুল্লুস চোখ বড় করে বলল—একজন মানে ?

—ছোটকাকাবাবু গ, তাঁরই কথা বলতেচি।

—তুই জানিস কিছু ছোটকার কথা ?

—ওই দেহো। আমি কি করে জানবো গো।

—তা তুই আবার ফিরলি কেন ?

—তোমাকে বলতি গো। বেশি বেলা করুনি। যা দিনকাল।

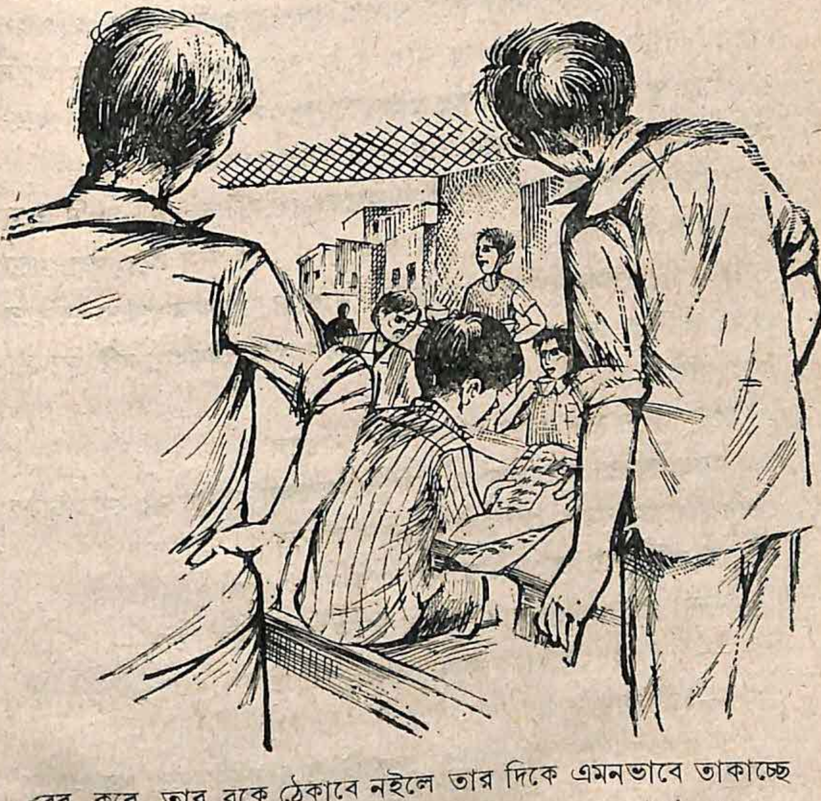
ও, এই জন্যে। যা বাড়ি যা এক্ষুণি।

এই লোকটাকে একদম বিশ্বাস নেই। যদিও বিশ্বাসী লোক বলে বাড়িতে ওর সুনাম আছে, তবু সে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে কতক্ষণ। সকাল থেকে এই লোকটার সঙ্গেই বা বার বার দেখা হচ্ছে কেন তার। থামের আড়াল থেকে গুল্লুস দেখল—বনমালী লেভেল ক্রশিং পার হয়ে সত্যিই বাড়ির দিকে চলে গেল, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে গুল্লুস থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে আবার চলতে শুরু করল।

প্রথম যে তে-মাথার মোড় পড়ল সেখানকার চায়ের দোকানের নাম পান্থসখা। একটু ইতস্তত করে এবং ভালো করে চারদিক দেখে নিয়ে গুল্লুস ঢুকে পড়ল। চায়ের দোকানগুলোই তো খবরাখবরের কেন্দ্র হয়। ভয়ঙ্কর কালো হাড় জিরজিরে তারই সমবয়সী যে ছেলেটা চা দিচ্ছিল, তাকে বলল, ভাই খবরের কাগজটা একটু দেখব।

ভাবখানা এই রকম যেন সে খবরের কাগজ পড়তেই এসেছে। বিনা পয়সায় কাগজ পড়ার খদ্দের দিনের মধ্যে অনেকেই এসে থাকে। দোকানের ছেলেটি বলল, পড় না, ঐ তো রয়েছে।

সে খবরের কাগজে সবে চোখ দিয়েছে এমন সময় দুজন ভয়ানক চেহারার ও নোংরা পোশাকের লোক এসে দোকানে ঢুকল। প্রথম দর্শনেই গুল্লুসের মনে হল এরা শত্রুপক্ষের লোক, তাই তার পিছু নিয়েছে। হয়তো বা বনমালীর কাছ থেকে খবর পেয়েই এখানে আসছে। এখনি ভয়ানক কিছু ঘটে যেতে পারে। ঐ দুজন নিশ্চয়ই তার পরিচয় মতলব সব জানতে পেরে গেছে। এখনি হয়তো ছোরা



বের করে তার বুকে ঠেকাবে নইলে তার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে কেন। গুল্লুস ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তার মনে হল, উঠে পালায়। তারপরই তার মন বলল, উঁহু, সে ভয় পেয়েছে তা কোনমতেই প্রকাশ করা চলবে না। যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব নিয়ে সে কাগজ পড়তে লাগল।

আসলে কাগজটা মুখের সামনে ধরে রইল। কাগজ পড়ার মত মনের অবস্থা তখন তার ছিল না। তার সমস্ত মন পড়ে ছিল ঐ ভয়ানক চেহারার নোংরা পোশাকের লোক দুটোর পেছনে।

লোক দুটো একটা বেঞ্চের ওপর পাশাপাশি বসে পড়তে কালো রোগা ছেলেটি তাদের টেবিলের ওপর প্রথমে দু গ্লাস জল, তারপর দু প্লেট আলুর দম, তারপর দুটো কোয়ার্টার সাইজের পাঁউরুটি এনে রাখল। লোক দুটো সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া শুরু করে দিল এবং গোগ্রাসে খেতে লাগল। গুল্লুস দম বন্ধ করে তাই দেখতে লাগল। কেন জানি না, ওদের খাওয়া দেখে তার বক রাক্ষসের কথা মনে পড়ে গেল। খেয়ে-দেয়ে গায়ে জোর করে নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না তো?

পাঁউরুটি আলুর দম শেষ হলে কালো ছেলেটি দু প্লেট ঘুঘনি এনে দিল, সঙ্গে পাঁউরুটি। সে সব শেষ করে পুরো এক গ্লাস করে জল খেয়ে লোক দুটো যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে অবশ্য গুল্লুসের দিকে আর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গেল।

গুল্লুস মনে মনে বলল, যাঃ বাবা বাঁচা গেল।

বকরাক্ষসেরা বেশ কিছু দূর চলে গেলে গুল্লুস দোকানের ছেলেটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, লোক দুটো কে বলো তো?

ছেলেটি ফিরে তাকে প্রশ্ন করল, কেন বলো তো?

—না এমনি। যেভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিল, তাই—

—ও। ওরা তোমাকে নতুন দেখছে তো তাই।

—ওরা কারা?

ভীষণ ভয় পেয়ে গেছ দেখছি। ছেলেটি হেসে বলল, ওরা খুব ভালো লোক। আমাকে তো মাঝে মাঝে পয়সা দেয় লজেঞ্চুস কিনতে। ঐ যে ক্যাকটরিটা দেখছ, ওখানে কাজ করে। রোজ টিফিন খেতে আসে, তোমাকে তো এ সময় কোনদিন দেখেনি। তাই—

তাই তার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল। এতক্ষণে বোঝা গেল।

গুল্লুস মনে মনে বলল, ভালো হলেই ভালো। ওদের চেহারা কিন্তু মোটেই ভালো নয়। কেমন যেন জহ্লাদের মত দেখতে।

লোক দুটো চলে গেলে দোকানে আর কোন খদ্দের নেই। দুপুরের এই সময়টায় খদ্দের বেশি থাকে না। দোকানের মালিক বাড়িতে খেতে গেছে। দোকান একেবারে ফাঁকা। সে আর ছেলেটি ছাড়া দোকানে আর কেউই নেই। তবু সে অত্যন্ত নিচু গলায় ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা এখানে খেলাধুলোর কি কি ক্লাব আছে?

—কেন তুমি ভর্তি হবে না কি? ছেলেটি মুচকি হাসল।

—হ্যাঁ। গুল্লুস সোজাসুজি একটি ডাহা মিথ্যে কথা বলল। আছে নাকি কোনো খেলাধুলোর ক্লাব? ব্যায়াম ট্যায়ামের হলেও হবে।

খেলাধুলোর ক্লাব? ছেলেটি হো হো করে হেসে উঠল।

হাসছ যে।

—এখানকার ক্লাবে তো খেলা হয় না।

—খেলা হয় না, তবে কী হয়?

—পূজো হয়।

পূজো হয়? গুল্লুসের বুকটা মাটিতে পড়া রবারের বলের মত লাফিয়ে উঠল। সে উত্তেজনা চেপে বলল, কোন্ ক্লাবের পূজোয় বেশি ঘটা হয় ভাই?

ছেলেটি হাত উলটে বলল, ঘটা তো এখন সব ক্লাবের পূজোতেই।

গুল্লুস বলল, তবু।

—তবু আবার কি।

এঁটো কাপ-প্লেট সরাতে সরাতে ছেলেটি বলল, তোমার সঙ্গে গল্প করার সময় আমার নেই।

গুল্লুসের বুকটা দমে গেল, তবু সে বলল, বলো না ভাই। ওরি মধ্যে নামডাক কার বেশি।

ছেলেটি বলল, কি নাছোড় ছেলে হে তুমি। বলব না যাও।

বলেই আবার বলল, নবারুণ সংঘের। মিতালী সংঘের অসুরটা

অবশ্য প্রতিবছরই দারুণ হয়। তবে শনিবার সংঘের বারো হাত কালীর কাছে কেউ লাগে না।

শনিবার সংঘ? ছেলেটা কি বলল, শনিবার সংঘ? নামটা শুনেই গুল্লুসের বুকটা দুলে উঠল। এই তো ছোটকার সেই শ—স। শর্বরী কর্বরী সে কত কি ভেবেছিল। ইউরেকা। লাফিয়ে উঠে পড়ল সে বেঞ্চ ছেড়ে।

চায়ের দোকানের ছেলেটি বলল, যত্তো সব ফালতু খদ্দের। অন্য সময় হলে এ কথায় গুল্লুস নিশ্চয় রাগ করত। কিন্তু এখন অবস্থা অন্য রকম। এখন তার একমাত্র লক্ষ্য শনিবার সংঘ—ছোটকার ডায়েরির সেই শ—স। যে করে হোক খুঁজে বের করতেই হবে। হাতে বেশি সময় নেই।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে কতক্ষণ? অথচ আজ রাত্রের আগেই যা কিছু করে ফেলতে হবে। একটা রাত পার হতে দেওয়া উচিত হবে না। এক রাতের মধ্যে শত্রুরা কোথায় ছোটকাকে সরিয়ে ফেলবে কে বলতে পারে!



একটু এগোতেই একটা পান বিড়ির দোকান। দোকানকে ঘিরে কিছু লোকের জটলা দেখা গেল। তবে কি, তার ছোটকাকে ঘিরেই এই জটলা? গুণ্ডারা কি তাকে মারধোর করছে? না, দূর থেকে গুল্লুস যা ভেবেছিল তা নয়। কিছু লোক হৈ হল্লা করে ক্রিকেটের রীলে শুনছে। অন্য সময় হলে সেও দাঁড়িয়ে পড়ত নিশ্চয়। বিশ্বনাথ একটা ক্যাচ ধরাতে জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ল। কে একজন বলল, কে গেল? একজন বলল, কালীচরণ। গুল্লুসেরও খুব ইচ্ছে হল জেনে

নেয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কে আউট হল, সত্যিই কালীচরণ না অন্য কেউ। কিন্তু সে লোভ সংবরণ করে এগিয়ে গেল। হাতে সময় বড় অল্প।

র‍্যাশনের থলি হাতে নস্যি রংয়ের র‍্যাপার গায়ে এক কেরাণীমত ভদ্রলোককে গিয়ে সে ধরল, শনিবার সংঘটা কোথায় বলতে পারেন?

লোকটা দাঁত খিঁচিয়ে বলল, জাহান্নামে।

বোঝা গেল লোকটা শনিবার সংঘের ওপর মোটেই খুশী নয়। খুব স্বাভাবিক, যে ক্লাবের ছেলেরা তার ছোটকার মত ছেলেকে ধরে নিয়ে যায়, সে ক্লাবের ওপর যে লোকটা খুশী নয়, এতে গুল্লুস খুশীই হল। সে যাই হোক, শনিবার সংঘের ঠিকানা জাহান্নাম হলেও তা তাকে খুঁজে বের করতে হবে।

আরও খানিকটা এগোতেই একটা মনোহারী জিনিসপত্রের দোকান সঙ্গে লজেন্স বিস্কুট। দোকানীকে জিজ্ঞেস করতেই অবাক কাণ্ড। দোকানী বলল, এই তো তুমি শনিবার সংঘের সামনে দাঁড়িয়ে আছ।

গুল্লুস এদিক ওদিক তাকাচ্ছে দেখে দোকানী উল্টো দিকের বাড়িটা দেখিয়ে দিল, ঐ তো তোমার সামনে।

একটা পুরনো অকেজো গ্যারেজ ঘরের মধ্যে ক্লাব। কিন্তু সেটা এখন তালাবন্ধ। সব সময়ই তালাবন্ধ থাকে বলে শোনা গেল। খোলে ন'মাসে ছ'মাসে। কোন সাইন বোর্ড নেই। শুধু দেয়ালের গায়ে ভুল বানানে এক জায়গায় লেখা ঃ শনিবার সংঘ! ন-এর জায়গায় ণ। শনিতে দন্ত্য-ন হবে, তাও জানে না এরা। গুল্লুসের মনে হল এটাই স্বাভাবিক। বানান ঠিক ঠিক জানলে এরা ছোটকাকে ধরে নিয়ে যাবে কেন?

গুল্লুস আবার ফিরে এল মনোহারী দোকানীর কাছে। বলল, আচ্ছা, ঐ ক্লাবের সেক্রেটারির সঙ্গে একটু দেখা হয় না?

—সেক্রেটারি? সেক্রেটারি বলে তো কেউ নেই। দোকানী জানাল।

—তবে ক্লাব চালায় কে? —গুল্লুস বলল।

—কেন দাদারা।

—দাদারা ? তার মানে ?

—নাঃ, তুমি এসব বুঝবে না। তোমাকে বলাই মিছে।

—না বলুন। আমার জানা দরকার। গুল্লুস জেদ ধরল।

দোকানী অবাক চোখে গুল্লুসের দিকে তাকাল, কেন হে। তুমি তো ইস্কুলে পড় বলে মনে হচ্ছে। এসব লোকের সঙ্গে তোমার কী দরকার ?

—ঠিক আমার দরকার নয়। গুল্লুস এবার আমতা আমতা করে বলল, দরকার আমার ছোটকার। ছোটকা আমাকে পাঠিয়েছে তার সঙ্গে দেখা করতে।

কার সঙ্গে দেখা করতে ? দোকানী হাসল।

—এই দলের দলপতির সঙ্গে। গুল্লুসের মুখ দিয়ে ছুটে গেল কথাটা।

—দলপতি ? বাঃ বেশ বলেছ ছোকরা। তুমি বুঝি বাংলায় ফার্স্ট হও। দল যখন আছে, দলপতিও নিশ্চয়ই আছে। তাহলে তুমি সোজা চলে যাও টেবো সরকারের কাছে। সেই এই দলের দলপতি।

দোকানী মজার লোক। বেশ কথা বলে। লোকটা ভালো বলেও মনে হয়। গুল্লুস ভাবল এর কাছে টেবো সরকারের বাড়ি কোথায় জেনে নেবে। এমন সময় সাদা-কালো ডোরা কাটা গেঞ্জি গায়ে একটি ছেলে এসে দাঁড়াল। দোকানী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খেঁকিয়ে উঠল, এই ডাবু, তোর কী চাই রে ? পয়সা এনেছিস ? পয়সা নিয়ে আয়। পয়সা না আনলে আর একটাও জিনিস পাবি না।

গুল্লুসের মনে হল দোকানী এখন ডাবুকে নিয়ে যে রকম চেঁচামেচি জুড়েছে তাতে তার কথার উত্তর দেবে না। এখানে দাঁড়ানো মানে সময় নষ্ট। সে রাস্তায় নেমে পড়ল।

মনোহারী দোকান ছেড়ে রাস্তায় পা দিতেই প্রায় তার পেছন পেছন সেই ছেলেটি—সেই ডাবু এসে তাকে ধরল, এ্যাই খোকা—

প্রায় সমবয়সী, দু-এক বছরের বড় হতে পারে, কিন্তু দেখ ধরন-ধারণ এক্কেবারে বড়োদের মত। তাকে খোকা বলে ডাকছে। গুল্লুস বিরক্ত হল, উত্তর দিলনা।

এবার ডাবু এসে তাকে ঠেলা দিল, ডাকছি শুনতে পাওনা ?

গুল্লুসের একবার মনে হল ডাবুর মুখে একটা ঘুষি বসিয়ে দেয়। তাহলেই বাছাধন বুঝবে তার ঘুষির জোর। কিন্তু এখন কোনরকম মারপিট গণ্ডগোলের মধ্যে জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না, পড়লেই সব মাটি। এখনো ছোটকা এই অঞ্চলেই কোথাও বন্দী হয়ে আছে। সে শুধু মুখ শক্ত করে ঘুরে দাঁড়াল।

ডাবু বলল, বেপাড়ায় এত ঘোরাঘুরি কিসের ?

—তাতে তোমার কি ? গুল্লুস এটুকু না বলে পারল না।

—আমার কি ? দেখবি ? টেবোদাকে দেবো বলে ? টেংরি খুলে নেবে।

একটু ঘাবড়ে গেল গুল্লুস ; তাহলে এই ডাবু যে সে লোক নয়। টেবোদার চেলা। তাহলে সে শত্রুপক্ষের একেবারে মুখের মধ্যে এসে পড়েছে। তার বুকটা একটু কেঁপে উঠল। এখন কোনো মতেই ডাবুকে চটানো ঠিক হবে না। সে যদি চেঁচামেচি শুরু করে দেয়, স্বয়ং টেবো সরকারই ছুটে আসতে পারে। আর তাহলে তো ছোটকার সঙ্গে সে নিজেই এদের হাতে বন্দী হয়ে পড়বে। এখন যে-কোনো উপায়ে ডাবুর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া চাই। কিন্তু কোন্ উপায়ে ? ডাবু তো এক-ভাবে তার দিকে তাকিয়ে। সে কি ছুট দেবে ? সে কিছুই ঠিক করতে পারছে না, এমন সময় ডাবু নিজেই বলল, যাঃ আজকের মত ছেড়ে দিলুম।

যাক্। ডাবু তাহলে ওর সত্যিকার পরিচয় ধরতে পারে নি। সে যে গুল্লুস, পরিতোষ চ্যাটার্জির ভাইপো তা জানতে পারলে কি আর তাকে এত সহজে ছাড়ত ? কিন্তু ডাবু ওদিকে ছুটলো কোথায় ? ওদিকে একটা কাটা ঘুড়ি লক্ষ্য করে একপাল ছেলেবুড়ো লগা-লগি নিয়ে ছুটেছে।

ডাবু একটা কঞ্চি তুলে নিয়ে সেই দলে মিশে গেল।

ডাবু চলে যেতেই নতুন এক ধরনের ভয় এসে গুল্লুসকে চেপে ধরল। এবার বোধহয় টেবো সরকারের মুখোমুখি হবার সময় হয়ে এলো। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর লোকটার মুখোমুখি হলে সে তো একেবারে শেষ হয়ে যাবে। সেটা হবে স্রেফ বোকামি। গায়ের জোরে নয়, তাকে কৌশলে কাবু করতে হবে। গুল্লুস মনে মনে ঠিক করে নিল। কিন্তু সবার আগে তার আস্তানাটা জানা চাই। সেই রাস্তার একটা লোককে ধরে খুব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, দাদা, টেবো সরকারের বাড়িটা কোথায় জানেন?

লোকটা একেবারে খেঁকিয়ে উঠল, জানবো না? বলো কি খোকা! টেবো সর্দারের বাড়ি বলে কথা। ঐ যে সামনে সুপুরি গাছের সারি, ঐ বাড়িটা।

টেবো সরকারকে লোকটা টেবো সর্দার বলে উল্লেখ করল। নিশ্চয়ই টেবো সর্দারি করে বেশ নাম করেছে। গুল্লুসের বুকটা আরও খানিকটা দমে গেল। কিন্তু ছোটকার কিছুটা সন্ধান পেয়ে ভয়ে সে পেছিয়ে যাবে! না, ঐ বাড়িরই কোথাও হয়তো তার ছোটকাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। সাহসে বুক বেঁধে সে এগিয়ে গেল।

বাড়ির রোয়াকের ওপর খড়ির দাগ কেটে তার চেয়েও ছোট দুটি ছেলেমেয়ে এক্কা-দোক্কা খেলছিল। ছেলেটি জানাল, তার টেবোকাকা তো এখন বাড়ি নেই।

গুল্লুস ছেলেটিকে কাছে ডেকে বলল, বাড়ি নেই তো কোথায় আছে? কলেজে?

ছেলেটি বলল, ধেৎ, কিছু জানে না। কাকা সেই কবে কলেজ ছেড়ে দিয়েছে।

ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। টেবো সরকার তো এরকমই কেউ হবে। গুল্লুসের মনে নতুন করে উৎসাহ এল। উত্তেজনা চেপে সে বলল, বাঃ তুমি তো অনেক খবর রাখো খোকা। বলো তো এখন তোমার কাকা

কোথায় ?

ছেলেটি ভেংচি কেটে মুখভঙ্গি করে বলল, ইল্লি, বলবো না তো। এই বলে সে আবার এক্কা-দোক্কা খেলায় মন দিল।

গুল্লুস এখন কি করবে ? আসল খবরটাই তো জানা হল না। এদিকে ছেলেটির যা মতিগতি। ওর কাছ থেকে কথা আদায় করেই বা কি করে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, পকেটে আজকের টিফিনে না খাওয়া লজেন্সটি রয়ে গেছে। সে সেটি উঁচু করে তুলে ধরে বলল, বেশ বলবে না তো, তাহলে এই লজেন্সটাও পাবে না।

ছেলেটি লাফিয়ে ছুটে এল, ওই যে মাঠের মাঝ মধ্যিখানে খালি বাড়িটা দেখছ, ওখানে তাস খেলতে গেছে। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো হুড়মুড়িয়ে বলে গুল্লুসের হাতেধরা লজেন্সটা ছিনিয়ে সে আবার ছুটে চলে গেল।



তাস খেলতে গেছে ? মাঠের মাঝখানে পোড়ো বাড়িতে ? কেন নিজের বা বন্ধুর বাড়িতে বসে তাস খেলা যায় না ? আর এক মুহূর্ত দেরী করা চলে না। গুল্লুসের মনে হল এখনি ছুটে যায় ঐ পোড়ো বাড়িতে, গিয়ে উদ্ধার করে নিয়ে আসে তার ছোটকাকে। মুহূর্তের জন্যে সে বে-খেয়াল হয়েছিল, তাই এমন ভাবতে পারল। খালি হাতে শত্রুর গুহায় কোন নির্বোধ যায় ?

এমন নির্বোধের কাজ কে করে ? অন্তত গুল্লুস নয়। পড়িমরি করে ছুটে বাড়ি চলে এলো সে। মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে নিল কি কি জিনিস সঙ্গে নিতে হবে। গুলপাড়ার মাঠে কাঁটা ঝোপ আছে বিস্তর, খানাখন্দও কম নেই। কেডসের জুতো জোড়া পরে নিল, পিঠে ঝুলিয়ে

নিল স্কুলের ওয়াটার বটল, আর কোটের পকেটে নিল টয় পিস্তল— যেটা পিসেমশাই গতবার তার জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন। জানা না থাকলে যেটাকে হুবহু সত্যিকার পিস্তল বলেই মনে হয়। এই পিস্তলটা এর আগে কোন কাজে লাগে নি, শুধু ছোটকারা একবার সখের থিয়েটারে ব্যবহার করেছিল। আর এবার ছোটকার উদ্ধারে সত্যিকার কাজে লাগবে।

থিয়েটারে সেটা ছিল একটা সত্যিকারের খুনের দৃশ্য। স্টেজের পেছন থেকে তাই পটকা ফাটিয়ে আওয়াজ করা হয়েছিল। এবারে সে সব কিছু নয়। কিন্তু আরো বেশি কাজে লাগবে।

তাকে বাড়ি এসেই আবার হন্তদন্ত হয়ে বেরোতে দেখে মা বললেন, সারাদিন টো টো করে কোথায় ঘুরছিস ?

কোটটা গায়ে চাপাতে চাপাতে গুল্লুস বলল, কোথায় আবার যাবো। এখানেই তো ছিলুম। মা বললেন, আবার বেরুচ্ছিস ?

গুল্লুস সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, মা ছোটকা এখনো ফেরে নি ?

না। কি জানি কি যে হল ছেলেটার। মার মুখটা থমথমে হয়ে গেল। ছোটকাকে গুল্লুসের মত তার মাও ভালবাসে।

মনে মনে গুল্লুস বলল, আমি জানি কি হয়েছে ছোটকার। কিন্তু সে কথা এখন নয়। এখনো সময় আসে নি সে কথা বলার।

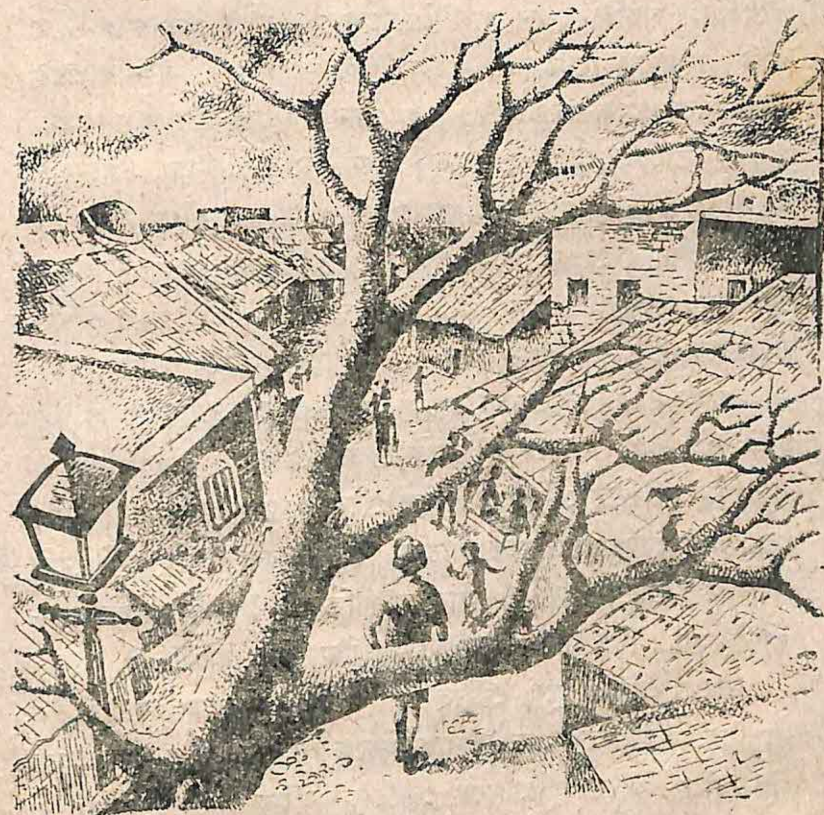
মা বললেন, দুধটা খেয়ে যা।

গুল্লুস কোনমতে বলল, এসে খাবো। তারপরই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

লেভেল ক্রসিং-এর কাছে গিয়ে সে আবার ফিরে এলো। কালো রঙের একটা চশমা পেলে হত। সে গল্পে পড়েছে ডাকাতরাও কালিঝুলি মেখে ডাকাতি করতে যেত, তাতে তাদের চেনা যেতো না। তার মনে এলো রথের মেলা থেকে কেনা রাক্ষস মার্কা মুখোশটার কথা। সে আবার বাড়ি ফিরে এলো। দেয়ালে লটকানো মুখোশটা

ধুলো ঝেড়ে নিজের গলায় ঝুলিয়ে নিল। প্রয়োজন হতে পারে।

একে একে সে পেরিয়ে গেল লেভেল ক্রসিং চায়ের দোকান 'পান্থসখা' মনোহারীর দোকান, একটু এগিয়ে সেই কালভার্ট ঘুঁটে দেওয়া লম্বা টানা পাঁচিল। সে হেঁটে চলছে না ছুটে চলছে সে নিজেই জানে না। শীতকালের বিকেল কতক্ষণই বা তার আয়ু, একটু পরেই তার আয়ু ফুরোবে, তার আগেই তাকে পৌঁছুতে হবে গুলপাড়ার মাঠের মাঝখানে খাপছাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সেই পোড়োবাড়িতে। সাধারণ পোড়োবাড়ি নয়, শত্রুপক্ষের দুর্গ।



রাস্তার ধারে এক জায়গায় একটা খাটা পায়খানা। ঘরের দেওয়ালে ভারি মজার বিজ্ঞাপন আঁটা রয়েছে। ফুলস্কেপ কাগজ

সাইজের টিনের পাত—তাতে আঁকা পদ্মফুল এবং সেই পদ্মফুলের মাঝমধ্যিখানে সুন্দর করে লেখা "খাঁটি পদ্মমধু।" পায়খানার গায়ে লেখা পদ্মমধু। ব্যাপারটা হাসির। কিন্তু হাসবার সময় নেই তার। সে "খাঁটি পদ্মমধু" ফেলে এগিয়ে চললো। কেবলই তার ছোটকার কথা মনে হতে লাগলো। ছোটকাকে কি ওরা বেঁধে রেখেছে না ছেড়ে রেখেছে! হয়তো মেরে আধমরা করে দিয়েছে এতক্ষণে।

সে বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ঠিক অন্যমনস্ক নয়, বলা যায় অনন্যমনস্ক, অর্জুনের মত একটি মাত্র লক্ষ্যবস্তুতে তার মন একেবারে গেঁথে ছিল। চারদিকের সব ভুলে গিয়েছিল সে। হঠাৎ যেন জেগে উঠল একটু। রাস্তার ওপর ডাবু দাঁড়িয়ে না? হাঁ ডাবুই তো। সর্বনাশ ওরই সামনে দিয়ে তাকে যেতে হবে। অন্য কোন পথ তো তার জানা নেই। ডাবু কি তাকে দেখতে পেয়েছে? মনে হয় না, কেন না এখনো ও আকাশের দিকে তাকিয়ে—বোধহয় ঘুঁড়ির প্যাচ দেখছে এক মনে। তবু ওরই সামনে দিয়ে তাকে যেতে হবে তো। চট করে সে গলায় ঝোলানো মুখোশটা মুখে এঁটে নিল। তারপর অতি সহজ ভঙ্গিতে ডাবুর সামনে দিয়ে হেঁটে চলে গেল। না! মুখোশ সঙ্গে আনা সার্থক। ডাবু তাকে একদম চিনতে পারে নি। গুল্লুসের মুখে উত্তেজনার সময়েও হাসি ফুটে উঠল। ডাবুকে খুব ফাঁকি দেওয়া গেছে।

কিছু দূর গিয়ে সে মুখোশটা মুখ থেকে খুলে ফেলল। সারা পথটা তো আর মুখোশ পরে যাওয়া যায় না, গেলেই বরং লোকের দৃষ্টি বেশি করে তার দিকে পড়বে। আর দুটো তিনটে বাঁক পেরোলেই গুল-পাড়ার মাঠ। কিন্তু তার আগেই এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

প্রথম বাঁকের মুখে পৌঁছে সে জায়গাটা ভালো করে দেখে রাখছিল, এই পথেই তো আবার ফিরতে হবে। মুভি ক্যামেরার মত মুখ আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে সে দেখছিল সবকিছু। এভাবে পুরোপুরি পেছন ফিরতেই গুল্লুসের বুক কেঁপে গেল। সাইকেলে চেপে ডাবু আসছে। তারই দিকে ছুটে আসছে। সে হেঁটে আর ডাবু সাইকেলে, অর্থাৎ তাকে

ধরে ফেলবে। মুহূর্তের জন্যে বিচলিত হলেও কর্তব্য স্থির করে ফেলল সে। এখনো ডাবু এবং তার মধ্যে বেশ খানিকটা ব্যবধান। গুল্লুস প্রাণপণে ছুটতে লাগল।

কতক্ষণ ছুটেছে কত সময় ছুটেছে গুল্লুসের কিছুই খেয়াল নেই। এক জায়গায় এসে দেখল একটা গলিতে রাস্তা সারাইয়ের কাজ হচ্ছে। চারদিকে ইট পাথর কুচি, পিচের ড্রাম, পিচ গলানো গাড়ি ইত্যাদি। এলোমেলো ছড়ানো। সে ভাবল, সেই গলির মধ্যে ঢুকে যাবে। এই খোঁড়াখুঁড়ির রাস্তায় সাইকেল চলবে না। সহজেই লুকিয়ে পড়া যাবে এবং নিজেকে বাঁচানোও যাবে।

যা অনুমান করা গিয়েছিল ঠিক তাই। পিচের ড্রামের আড়াল থেকে গুল্লুস ভয়ভয় চোখে দেখল, ডাবু সাইকেল থেকে নামল। তারপর সাই-কেলটা একটা পাঁচিলের গায়ে ঠেসান দিয়ে রেখে তারই দিকে ছুটে আসতে লাগল। তবে কি সে তাকে দেখতে পেয়ে গেছে? চট্ করে গুল্লুস এক পিচের ড্রামের আড়াল থেকে আর এক ড্রামের আড়ালে চলে এলো।

ছোটকার সঙ্গে চৌরঙ্গীতে বিলিতি এডভেঞ্চার ছবি দেখতে গিয়ে ঠিক এই ধরনের এক দৃশ্যই সে দেখেছে। ডিটেকটিভ আর গুণ্ডার দলের সর্দারের এই ধরনের লুকোচুরি খেলা।

তার নিজের জীবনে যে সেই দৃশ্য এমনভাবে একদিন সত্য হয়ে উঠবে তা কি সে স্বপ্নেও কোনদিন ভেবেছিল! কিন্তু সে সব চিন্তা করার সময় এখন নয়! মরিয়া হয়ে ডাবু তাকে খুঁজছে। আর সে একটা থেকে আর একটা পিচের ড্রামের আড়ালে সরে গিয়ে ডাবুকে এড়িয়ে যাচ্ছে।

এভাবে সে কতক্ষণ আত্মরক্ষা করতে পারবে? সরতে সরতে সে আবার ঘুরে-ফিরে বড় রাস্তার মুখে এসে পড়ল। শেষ ড্রামের গায়ে এসে গুল্লুস কিছুক্ষণের জন্যে থমকে দাঁড়াল। যেন সে এক অন্তরীপের মাথায় এসে ঠেকেছে, এখান থেকে এগোনো মানে সমুদ্রের জলে পড়ে

যাওয়া। এই শেষ ড্রামের আড়ালটুকু খসে গেলেই আর রক্ষা নেই। ডাবু নিশ্চয়ই তাকে দেখে ফেলবে।

নতুন করে আর এক রাউণ্ড লুকোচুরি খেলবে কিনা গুল্লুস একটু ভাবল। এমন সময় তার চোখে পড়ল সামনের পাঁচিলের গায়ে ডাবুর সেই সাইকেলটা। তার মাথার মধ্যে যেন খেলে গেল অদৃশ্য এক নির্দেশ —এ সুযোগ ছাড়া ঠিক নয়। চট্‌ করে সে ড্রামের মধ্যে থেকে বেরিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চলে এলো পাঁচিলের কাছে। তারপর সাইকেলে চেপে একেবারে বড় রাস্তার পথ ধরল। ডাবু তখনো খালি পিচের ড্রামগুলো উল্টে-পাল্টে তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এখনো গুল্লুস ঠিকমতো সাইকেলের প্যাডেলে পা পায় না। তবু সে প্রাণপণে চালাতে লাগল। রাস্তাটা এককালে পিচের ছিল। শুধু এইটুকু বোঝা যায়। কিন্তু পিচ বলতে কিছু আর এখন নেই। মাঝে মাঝেই ছোট বড় গর্ত। সে সব দেখেশুনে চালাবার সময় নেই, পেছনে নিশ্চয়ই ডাবু ছুটে আসছে। তারই সাইকেল নিয়ে বেপাড়ার ছেলে তাকে এভাবে ঠকাবে সে ভাবতেই পারে নি।

গুল্লুস মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছে, ডাবু কদ্দুর রয়েছে। না ডাবুকে দেখা যাচ্ছে না। বরং মাঠের পোড়োবাড়ি এখন বেশ স্পষ্ট। গুল্লুস ঠিক করে নিল তার কর্তব্য। আর এগোনো নয়। এবার সাইকেলটা ছেড়ে মাঠে নেমে পড়া দরকার। মাঠ ভেঙ্গে গেলে বাড়িটা বেশি দূরে নয়।

সাইকেল থেকে নেমে সে সেটিকে খানার মধ্যে শুইয়ে রাখল। তারপর চেনটা খুলে ঢিলে করে দিল। উদ্দেশ্য ডাবু এসে পড়লেও সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল ব্যবহার করতে পারবে না। বেশ কিছু সময় নষ্ট হবে তার সাইকেলের চেন পরাতে।

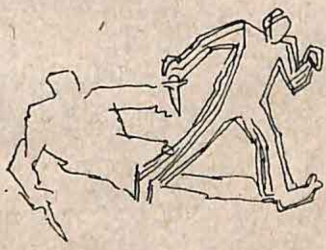
মাঠের পথ খুব এবড়ো-খেবড়ো অনেক জায়গায় পথ বলতে কিছু নেই। এখানে সেখানে কিছু আকন্দ, ভেরেণ্ডা বা আশশ্যাওড়ার গাছ। গুল্লুস প্রায় ছুটতে ছুটতে সেই পোড়োবাড়ির সামনে এসে হাজির হল। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে কেডস জোড়া পায়ে দিয়ে নিয়েছিল!

বাড়িটা এককালে নিশ্চয়ই বেশ বড়লোকের বাড়ি ছিল। দরজা জানালার মাথায় রঙ্গীন কাঁচের কাজ ঝিলমিল দেওয়া বারান্দা দেখে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। কিন্তু গুল্লুসের চোখ সেদিকে নয়। কোথাও কোনো মানুষজনকে উঁকি মারতে দেখা যায় কি না সে লক্ষ্য করতে লাগল।

নীচের তলায় কাউকে পাওয়া গেল না। বলতে কি নীচতলাটা বনজঙ্গলেই ভরা। ভাট আশশ্যাওড়া এই সব আগাছা। তবে এরই মধ্যে একটা সরু পায়ে চলা পথও বুঝি দেখা যায়। বেশ বোঝা যায় মানুষের যাতায়াত আছে। সেই পথ ধরে কিছু দূর যেতেই গুল্লুস সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো ফাঁকা চাতাল মত একটা জায়গায় এসে হাজির হল।

এখান দিয়েই সিঁড়ি ছিল ওপরে ওঠবার। কিন্তু ইট-কাঠ পাথরে সে পথ একেবারে বন্ধ। অন্তত সে পথ ব্যবহার করার কোন উপায় নেই। তবে কি এ বাড়িতে সত্যিই কেউ নেই। সে কি তবে ফিরে যাবে?

না, নিশ্চয়ই দ্বিতীয় কোন সিঁড়ি আছে অন্য দিক দিয়ে। চাতালের ওপর বসে পড়ে গুল্লুস এবার ওয়াটার বটল খুলে ঢকঢক করে খানিকটা জল খেয়ে নিল। তারপর আবার পর্যবেক্ষণ শুরু করল। না, এখান থেকে পায়ে চলা পথটা আর কোথাও যায় নি। এখানে এসেই শেষ হয়েছে। তাহলে?



হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল চাতালে এসে ওঠার আগে পথটা যেন একজায়গায় অস্পষ্টভাবে দু-ভাগ হয়ে গিয়েছিল। সে চাতাল থেকে আবার কিছুটা পেছিয়ে আসতেই অস্পষ্ট রেখার সেই পথ পাওয়া গেল। এখানে জঙ্গল আরও ঘন। এটা বাড়িটার পেছনের দিক। কিছুদূরে

এগোতেই দেখা গেল, আশশ্যাওড়া ভেরেণ্ডা ও কচুবনের মধ্যে থেকে অনেক কালের পুরোনো একটা কাঠের সিঁড়ি পিছনের বারান্দায় উঠে গেছে। এটা বোধহয় পেছনের বাগানে নামবার সিঁড়ি ছিল এককালে।

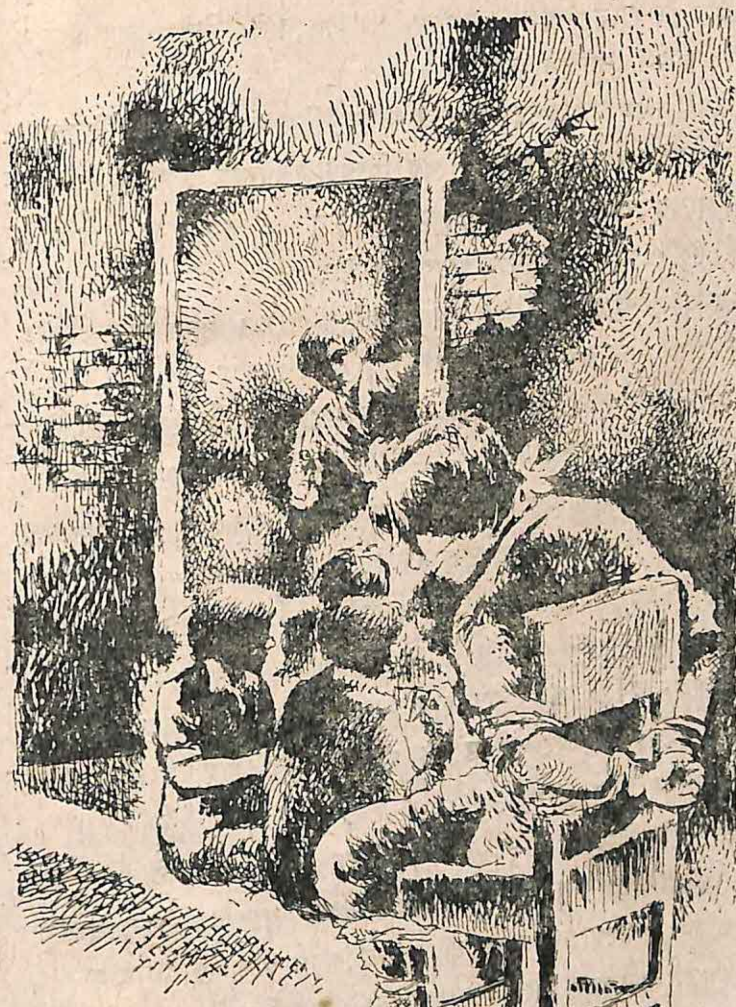
ওপর তলায় লোক আছে না নেই ? কেমন করে বোঝা যাবে ? সিঁড়িটার অবস্থা দেখে কিছুটা বোঝা যায়। যতখানি ধুলোর প্রলেপ, কুটিকাটি শুকনো পাতা পড়ে থাকার কথা ততখানি নেই। মনে হয় মাঝে মাঝে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাছাড়া—গুল্লুসের নজরে পড়ল সিঁড়ির একটি ধাপের ওপর পড়ে আধপোড়া দেশলাই কাঠি। আর দেখতে হবে না, নিশ্চয়ই ওপরে লোক আছে। সে অতি সন্তর্পণে বেড়াল পায়ে উঠে এলো বারান্দায়।

বারান্দার সঙ্গে লাগোয়া চার-পাঁচখানা ঘর। প্রথম তিন চারখানা ঘরে কেউ থাকে বলে মনে হয় না। দরজায় মরচে-পড়া তালা ঝুলছে, চৌকাঠের গোড়ায় পোকামাকড়ে মাটি তুলেছে। একটা ঘরের দরজার কপাট খুলে হাঁ হয়ে আছে। বেশ বোঝা যায় ঘরে কেউ থাকতে পারে না। সব শেষের ঘরখানা একটু অন্য রকম। দরজায় তালা দেওয়া নেই, দরজা ভেতর থেকে ভেজানো। শব্দহীন পায়ে এই ঘরের সামনে এসে গুল্লুস স্থির হয়ে দাঁড়াল।

জানলার কপাটও ভেজানো কিন্তু এক চিলতে যে ফাঁক হয়ে আছে তা দিয়ে ইচ্ছে করলে ঘরের ভেতরটা দেখা যায়। উঁকি মেরে সে যা দেখল তাতে ভয়ে ও আনন্দে তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। একটা চেয়ারের সঙ্গে ছোটকাকে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে। কথা বলার বা চেঁচানোর পথ বন্ধ, মুখে রুমাল ঠাসা। মেঝেতে ছেঁড়া মাদুরে বসে চারজন যুবক তাস খেলছে গভীর মনোযোগে। কারো কারো হাতে ধরা সিগারেট পুড়েই যাচ্ছে, খেয়াল নেই, এমনি মনোযোগ। মনে হয় ঘরের মধ্যে ছোটকার উপস্থিতি পর্যন্ত ওরা তাস খেলার খেয়ালে ভুলেই গেছে। কেউই ছোটকার দিকে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করছে না। এমনও হতে পারে ছোটকার নিরীহ ভাব সম্পর্কে

ওরা একেবারেই নিশ্চিত।

জানলার কপাটটা নিঃশব্দে সরাল সে। একমাত্র ছোটকা ছাড়া



কেউই সেদিকে তাকাল না। ছোটকার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই গুল্লুস ইশারা করল, চুপচাপ বসে থাকতে।

ঘরের ভেতরটা বেশ করে শেষবারের মত দেখে নিল গুল্লুস, অবশ্য জানলার ভেতর দিয়ে যতখানি দেখা সম্ভব। তারপর সরে এসে কাঁধের ধাক্কায় ভেজানো দরজাটা সশব্দে খুলে ফেলে টয় পিস্তল তুলে গুল্লুস হুংকার ছাড়ল, হ্যাণ্ডস্ আপ্।

টয় পিস্তলটার ওপর গুল্লুসের ভরসা ছিল অনেক। এই পিস্তলটা নিয়ে ছোটকারা এই সেদিন সখের থিয়েটার করেছে। সেদিন এটাকে সত্যিকারের পিস্তল বলেই বোধ হচ্ছিল তার। এদিকে সন্ধ্যে হতে আর বেশি দেরি নেই। ঘরের মধ্যে আরও অন্ধকার। সেই চার যুবক হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল গুল্লুসের রণমূর্তির দিকে। গুল্লুস আরও জোর দিয়ে আরও একবার বলল, হ্যাণ্ডস্ আপ্ এভরি বডি।

এ-রকম একটা ব্যাপার ঘটবে যুবক চারজনের হিসেবের মধ্যে ছিল না। তাছাড়া বিকেলের ঢিমে আলোয় খেলনা পিস্তলকে হুবহু সত্যিকার পিস্তলের মতই লাগছিল। বাচ্চা ছেলে গুল্লুসকে ভয় না পেলেও তার হাতে ধরা পিস্তলকে ভয় করতেই হয়। ঐ পিস্তলের চেম্বারে অন্তত ছটা গুলি ভরা আছে। তাদের চারজনকে খতম করতে চারটে গুলিই যথেষ্ট।

চারজন যুবকই ভয় পেয়ে হাত মাথার ওপর তুলে দাঁড়াল। গুল্লুস তাদের মধ্যে একজনকে পিস্তলের মুখে হুকুমের স্বরে বলল, 'আনটাই হিম।' বাঁধন খুলে দাও।

লোকটা সুবোধ বালকের মত এগিয়ে গিয়ে ছোটকার বাঁধন খুলে দিল এবং সুড় সুড় করে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ পিছমোড়া অবস্থায় একভাবে থাকায় ছোটকার হাত-পা বোধহয় অসাড় হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি, শরীর বেশ দুর্বল। বেশ কিছুক্ষণ লাগল তার চেয়ার ছেড়ে উঠতে। গুল্লুস তাকে তার পেছনে এসে দাঁড়াতে বলল। পরে যুবকদের দিকে ফিরে তাকিয়ে মিলিটারি ঢঙে বলল, এভরি বডি ফলো মি নাও।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে প্রথমে নেমে এল ছোটকা, আস্তে আস্তে পা

টিপে টিপে। তারপর গুল্লুস। সেই যুবকদের দিকে পিস্তল তুলে পেছন ফিরে এক-পা এক-পা করে নীচে নেমে এলো। আর সব শেষে গুটি গুটি করে নামল চার যুবক।

চাতালের কাছ বরাবর আসতেই যুবকদের মধ্যে দুজন ছোরা বের করল। খেলনা পিস্তলের কৌশল বাইরের আলোয় ধরা পড়ে গেছে। গুল্লুস ছোটকাকে বলল পালাও।

কিন্তু পালাবে কোথায় ? চারদিকে মানুষ প্রমাণ বনবাদাড়, ঘন ঝোপ আগাছা। অবশ্য এক দিকদিয়ে তাইতেই রক্ষে। বনজঙ্গলের মধ্যে লুকোচুরি খেলা শুরু হয়ে গেল। ঘন আগাছার মধ্যে দিয়ে গুঁড়ি মেরে মেরে যুবকদের থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল গুল্লুসরা। তারা ভাবছিল জঙ্গলটা বুঝি বেড়েই চলেছে বেড়েই চলেছে, বুঝি কোনদিন শেষ হবে না। কিন্তু হঠাৎই এক সময় জঙ্গল শেষ। তারা প্রাণ ভয়ে মাঠ ভেঙ্গে ছুটল লেভেল ক্রশিং লক্ষ্য করে।

মাঝে পড়ল খানাখন্দ, খোলার ঘর, ইঁটের পাঁজা। ইটের টুকরোয় পা আটকে গুল্লুস ছিটকে পড়ল একবার। হাঁটুর কাছটায় দারুণ ছড়ে গেল, রক্ত পড়ছে। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। ওরা ছুটছে ছুটছে ছুটছে। পথচারী ও দোকানীরা হাঁ করে দেখছে। তারা বুঝতে পারছে না ব্যাপারখানা কী। ওদের পেছন পেছন ছুটে আসছে চারজন উন্মত্ত যুবক। উদ্দেশ্য ওদের জখম করে সরে পড়বে।

সবার আগে ছুটছে ছোটকা, তার পেছনে গুল্লুস। তাদের ছুটতে দেখতে কোথা থেকে ছুটে এল এক দৈত্যাকার মোষ। ছোটকা কোনভাবে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেও গুল্লুস পারল না। গুল্লুস কি করবে, পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে মোষটা। সে কিছু না ভেবেই চট করে তার পেটের তলা দিয়ে গলে এল। ছোটকা একবার গোবরে হড়কে পড়ে গিয়েই উঠে দাঁড়াল।

এখন বোধহয় তারা অনেকখানি নিরাপদ। সেই চারজন যুবক বেশ কিছু পেছনে পড়ে গেছে। কিন্তু একি, সামনে পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছে

ডাবু। তার হাতে পাঁচ হাত লম্বা এক বাঁশ। গুল্লুস চেঁচিয়ে বলল ছোটকা এগিয়ো না। আর একটু হলেই ডাবুর হাতের বাঁশ ছোটকার মাথায় পড়েছিল।

গুল্লুস হঠাৎ নিচু হয়ে বসে পড়ে রাস্তা থেকে একমুঠো ধুলো তুলে নিয়ে ডাবুর চোখে ছুঁড়ে দিল। বাঁশ-টাঁশ ফেলে ডাবু চোখে হাত দিয়ে বসে পড়ল। গুল্লুস বলল, ছোটকা ছোটো।

কিন্তু ছোটকা আর ছুটতে পারছে না বেশ বোঝা যায়। বেচারী সকাল থেকে কিছু খায় নি। গুল্লুস তবু উৎসাহ দিয়ে বলল, ছোটকা, আর একটুখানি, আমরা এসে গেছি।

লেভেল ক্রশিং-এর কাছে এসে গুল্লুসরা বসে পড়ে হাঁফাতে লাগল। এমন দৌড় সে জীবনে দৌড়য় নি। শীতের বিকেলেও গেঞ্জি ঘামে ভিজে জাব। মুখ থেকে গরম ধোয়াঁ বেরুচ্ছে। যাক, আর বোধহয় ভয় নেই! দুপদাপ শব্দে মুখ তুলে ওরা দেখে সেই চারজন ছুটে আসছে, হাতে ছোরা। আসছে বলাও ভুল। এসে গেছে একেবারে তাদের ঘাড়ের ওপর। এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর বোধহয় রক্ষে নেই।

ঠিক সেই সময় দৈত্যের মত ছুটে এল এক ট্রেন। দেখতে দৈত্যের মত, আসলে দেবদূতের মত সেই ট্রেন। গুল্লুস কোন চিন্তা না করেই হ্যাচকা টানে ছোটকাকে তুলল, বলল চলে এসো এপারে। তাহলে ওরা আর আমাদের ধরতে পারবে না।

এপারে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ও শত্রুপক্ষের উদ্যত ছোরার মাঝখানে এসে দাঁড়াল বিরাট লম্বা সেই গুডস ট্রেন। চলন্ত চীনের পাঁচিলের মত আড়াল করে দাঁড়াল তাদের। গুল্লুস ও ছোটকা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল প্রাণ ভরে। মালগাড়ীটা চলে যেতে পুরো পাঁচ মিনিট লেগে গেল। তারা অবশ্য আর অপেক্ষা না করে দৌড়ে চলে এল নিজেদের বাড়ীতে। তারপর ঠিক কী ঘটেছিল তারা আর তা জানে না। জানবার কোন আগ্রহও ছিল না। ছোটকার সারাদিন খাওয়া হয়নি। বাড়ির বড়দেরও সেই অবস্থা।

বাড়িতে এসেও আর এক বিপদ। কেউ বিশ্বাস করতেই চায় না, গুল্লুসের সফল গোয়েন্দাগিরির কথা। কেউ কেউ এমন কথাও বলল, ছোটকা আর গুল্লুস নিজেদের মধ্যে বড় করে একটা গপ্পো বানিয়ে বলছে। আসলে ছোটকা অন্য কোন মতলবে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। রাঙাপিসি বিজয়ীর হাসি হেসে বলল, কি রে তোকে বলিনি, খিদে পেলে তোর ছোটকা ঠিক ফিরে আসবে।

গুল্লুস আর ছোটকা কী করে এদের বোঝাবে পুরোপুরি গোয়েন্দা কাহিনীর মত শোনালেও ব্যাপারটা সত্যি।

ছোটকার মনে গুল্লুসের জন্যে বেশ দুঃখ হল। এত বড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল, ঘটালো একটা ছোট ছেলে, ছোট ছেলে বলে কেউ তা বিশ্বাস করবে না। ছোটকা আবার হাতমুখ নেড়ে বোঝাতে গেল সবাইকে কি করে কি ঘটল। রাঙাপিসি হেসে ভালো ভালো সব খাবার ভর্তি মস্ত বড় একটা প্লেট ছোটকার সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, রাখ-দিকি তোদের গপ্পো। ভালো করে খা। নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে।

ছোটকা রাজভোগটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, উঁহু ওটা আমাকে নয়, ওটা গুল্লুসকে দাও।

—কেন ? গুল্লুসকে কেন ?

—ও যা আজ করেছে, ভাবতেই পারবে না।

খুড়ো ভাইপোয় খুব গুলবাজ হয়েছে। রাঙাপিসি হেসে চলে গেল।

গুল্লুস আর ছোটকা যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে এবং মনে মনে বলছে ধুত্তোর এদের বিশ্বাস করিয়ে—, ঠিক সেই সময় বনমালী ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল,—লাইনের ওপারে হৈ হৈ কাণ্ড—লেভেল ক্রশিং-এর কাছে চার চারজন গুণ্ডা মস্তান ধরা পড়েছে—হাতে আবার তাদের ইয়া বড় ছোরা।

গুল্লুস আর ছোটকা এক সঙ্গে লাফিয়ে উঠল, হল তো, এবার বিশ্বাস হলো তো।

ঘটনাটা পরদিন খবরের কাগজেও বেরিয়েছিল, অবশ্য একটু অন্য-

ভাবে। রিপোর্টাররা তো আর সব খবরের ভেতরের কথা জানতে পারে না। খবরের কাগজে লিখেছিল :

শনিবার সন্ধ্যার সময় চারজন যুবককে (সম্ভবত ওয়াগন ব্রেকার) ছোরা হাতে'—'লেভেল ক্রশিং-এর কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। মালগাড়ির শেষ বগিতে ছিল সশস্ত্র পুলিশ। তারা যুবক চারজনকে ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে তাদের হাত থেকে ছোরা কেড়ে নেয় এবং সেই সুযোগে জনসাধারণ এসে তাদের জাপটে ধরে ফেলে।

খবরের মধ্যে গুল্লুসের গোয়েন্দাগিরির ও দুঃসাহসিক অভিযানের উল্লেখ না থাকায় আমার খুব দুঃখ হয়েছিল। পরিতোষেরও খুব দুঃখ হয়েছিল। সে তো প্রায় ঠিক করে ফেলেছিল খবরটার ভেতরের খবর সব সে কাগজের অফিসে জানিয়ে আসবে। কিন্তু গুল্লুস? তার মনে এ নিয়ে কোন দুঃখ নেই। সে যে তার ছোটকাকে উদ্ধার করতে পেরেছে এতেই খুশী। সত্যিকারের ডিটেকটিভরা ঠিক এই রকমই হয়ে থাকে।
